এমফিল থিসিস

নজরুলের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র

নাজমুন নাহার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-'১০
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
আহমদ কবির
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

এমফিল ডিগ্রির জন্য প্রণীত 'নজরুলের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয় নি এবং প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয় নি।

নাজমুন নাহার
এমফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম একটি অসামান্য নাম। প্রতিভা আর বিচিত্র সৃষ্টিশীলতার কারণে নজরুল অমর হয়ে রয়েছেন। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান প্রাতঃস্মরণীয়। সংস্কৃতিকে কোনো জাতির আত্মপরিচয়ের মূলস্তম্ভ ধরা হয়। আর নজরুল সেই সংস্কৃতি বিনির্মাণে রেখেছেন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

সমকালীন সমাজে নারীর প্রতি যে জুলুম-নির্যাতন চলত, তাদের যে অবজ্ঞা-অবহেলা করা হত নজরুল ছিলেন সেসবের ঘোরবিরোধী। নারীকেও যে একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, নারীরও যে অসীম শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে, নারীও যে সমান সুযোগ পেলে পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নজরুল তা দেখিয়ে দেন চোখে আঙুল দিয়ে। নারী শুধু হেঁসেল আর ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তা বিশ্বাস করতেন না নজরুল। তাই নজরুলসৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো অনন্য হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানেও নারীর সরব উপস্থিতি নজরুল-সাহিত্যকে দিয়েছে ভিন্ন ব্যঞ্জনা।

নজরুল-সাহিত্যের বিশিষ্ট দিকগুলোর মধ্যে নারী প্রসঙ্গ অন্যতম। কবিতায় তো বটেই, তাঁর কথাসাহিত্যেও নারী এসেছে নানা রূপ-সুধায়। নজরুলের জীবনেও রয়েছে একাধিক নারীর ভূমিকা। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেও প্রকারান্তরে এসেছে সেসব নারীর কথা। নজরুলের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্রগুলোর স্বরূপ উন্মোচন এ অভিসন্দর্ভ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের বাংলা বিভাগের অধীনে এমফিল ডিগ্রিপ্রাপ্তির জন্য এ গবেষণাকর্মটি রচিত হয়েছে। এটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আহমদ কবির স্যারের অকৃত্রিম সহযোগিতা অনস্বীকার্য। তাঁর বিশেষ দিক-নির্দেশনা অভিসন্দর্ভটিকে পরিপূর্ণ হতে ভূমিকা রেখেছে। নিজের প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য

দিয়ে তিনি এ গবেষণাকর্মকে ঋদ্ধ হতে সহায়তা করেছেন। অভিসন্দর্ভটিকে অনুপুঙ্খ পাঠ করে তিনি পরিমার্জন-সংশোধনেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

সেই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ময়ূখ চৌধুরী, অধ্যাপক মাহবুবুল হক, অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক তাসলিমা বেগম, অধ্যাপক শফিউল আযম ডালিম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মিল্টন বিশ্বাসসহ অনেকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা না পেলে এ গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন করাই দুরূহ হয়ে উঠত।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগসহ রেজিস্ট্রার ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিশেষ সহযোগিতাও এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সাহায্য করেছে। গবেষণার জন্য আমি বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, নজরুল ইনস্টিটিউটসহ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা।

উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা-কর্মে আমার অগ্রজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটির শিক্ষক ড. বিএম মইনুল হোসেনসহ মা সালেহা খানমের ভূমিকার কথা না বললেই নয়।

এঁদের সবার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

নাজমুন নাহার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমফিল গবেষক নাজমুন নাহার আমার তত্ত্বাবধানে ‘নজরুল কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছে। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ৬/২০০৯-’১০। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশবিশেষ এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয় নি কিংবা কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয় নি।

আহমদ কবির
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় : নজরুলের জীবন-কথার আলোকে কথাসাহিত্য রচনার বিবরণ	৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : নজরুলের গল্পে নারীচরিত্র	২২
তৃতীয় অধ্যায় : নজরুলের উপন্যাসে নারীচরিত্র	৫০
উপসংহার	৯৬
গ্রন্থপঞ্জি	১০২

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাবস্ট্রাক্ট

নজরুলের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র

গবেষক

নাজমুন নাহার

বাংলা বিভাগ

কলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার নিপীড়িত মজলুম জনতার কাতারে দাঁড়ান তিনি। একজন সমতাবাদী, একজন সমাজবাদী সর্বোপরি একজন মানবতাবাদী হিসেবে সর্বাগ্রে ছিলেন নজরুল। ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে সকল সঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে, কুসংস্কার-কূপমণ্ডুকতা আর গোঁড়ামির মর্মমূলে তীব্র আঘাত হেনে নজরুল তৎকালে হয়ে উঠেছিলেন 'সবার'।

সর্বকালেই সাহিত্যের একটি প্রধান প্রসঙ্গ নারী। সে হিসেবে নজরুলের কবিতায় যেমন, তেমনি তাঁর কথাসাহিত্যে নারীর নানামুখী উপস্থাপনা হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট নারী যেমন এসেছে প্রেয়সী ভাবমূর্তি নিয়ে তেমনি এসেছে মাতৃমূর্তি কিংবা বিধ্বংসী-রূপেও। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্যই হয়তো এমনটা হয়েছে। নজরুলের কথাসাহিত্যে নারী চরিত্রগুলির উপস্থাপনা কেমন, তারা কতখানি সক্রিয়, তাদের প্রতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিই বা কেমন ছিল তা-ই তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান সন্দর্ভে।

নজরুলের গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসসমূহের পর্যালোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমালোচনা-গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রটি প্রণীত। সেজন্যে মূলত নজরুলের কথাসাহিত্য এবং সেসব সৃষ্টিকর্মের ওপর ভিত্তি করে রচিত সমালোচনা-গ্রন্থও এ গবেষণার পরিধিভুক্ত। অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে তথ্য পর্যালোচনার পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করে বিশদ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া শিরোনামযুক্ত বিষয়টিকে তিন অধ্যায়ে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে নজরুলের জীবন-কথার আলোকে কথাসাহিত্য রচনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। নজরুলের গল্পে নারীচরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তাঁর উপন্যাসে নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, নারীর অবস্থা সমাজে তখন কেমন ছিল, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নজরুল কতটুকু সোচ্চার ছিলেন এ বিষয়গুলিই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উপসংহারে সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে মন্তব্য করা হয়েছে।

যেহেতু গবেষণার বিষয় 'নজরুলের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র', সেজন্যে প্রাথমিক উৎস হিসেবে তাঁর গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসগুলোকেই বিবেচনা করা হয়েছে।

গল্পগ্রন্থ

১. ব্যথার দান

(প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৮, ফেব্রুয়ারি ১৯২২)

২. রিক্তের বেদন

(প্রথম প্রকাশ : ১৩৩১/১৯২৪)

৩. শিউলিমালা

(প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৩৮, অক্টোবর ১৯৩১)

উপন্যাস

১. বাঁধন-হারা

(প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৩৪/১৯২৭)

২. মৃত্যুক্ষুধা

(প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৩৬/১৯৩০)

৩. কুহেলিকা

(প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৩৮, জুলাই ১৯৩১)

এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন লেখক-গবেষকের প্রণীত গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। যথাযথ নিয়ম মেনে ও সূত্র উল্লেখপূর্বক তাঁদের উদ্ধৃত করা হয়েছে এ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যাকাশে মূলত একজন কবি হিসেবেই সুপরিচিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সবাই নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কিংবা 'প্রেমের' কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু এর বাইরেও যে কথাসাহিত্যের নানান উপাদান দিয়ে নজরুল বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন তা উল্লেখ করতেই হয়। কবি হিসেবে খ্যাতির চূড়ায় থাকা নজরুল কথাসাহিত্যেও রেখেছেন বিশেষ অবদান।

নজরুলের সাহিত্যিক জীবন কবি হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি আর জনপ্রিয়তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেও সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল গল্প রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশের আগেই প্রকাশিত হয় প্রথম গল্পগ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২২)। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ *রিক্তের বেদন* (১৯২৪), *শিউলিমালা* (১৯৩১) এবং *বাঁধন-হারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) ও *কুহেলিকা* (১৯৩১) উপন্যাস। তেইশ বছরের সাহিত্য জীবনে নজরুল লেখেন বাইশটি কাব্যগ্রন্থ, চৌদ্দটি সঙ্গীতগ্রন্থ, পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, তিনটি গল্পগ্রন্থ, তিনটি নাটক, তিনটি কাব্যানুবাদ, দুটি কিশোর কাব্য ও দুটি কিশোর নাটিকা।

মূলত উল্লিখিত তিনটি গল্পগ্রন্থ ও তিনটি উপন্যাসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে নজরুলের কথা সাহিত্যের নান্দনিক ভুবন। এবং তাতে অনিবার্যভাবেই এসেছে নারী, ধরা দিয়েছে নারীর বহুমাত্রিক রূপও। নারীকে শুধু নারী হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিকোণ নজরুলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মহিমান্বিত। মানুষের মর্যাদা দিয়ে নারীকে নজরুল দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন। ব্যক্তিজীবনে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল বিচিত্র নারীর। কোনো কোনো নারীর সান্নিধ্য নজরুলকে করে তুলেছিল আত্মাভিমানী, ক্ষুব্ধ, কখনোবা

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম-সুধাময়। এসবের প্রভাব স্বভাবতই তাঁর কথাসাহিত্যেও পড়েছে। তাই নজরুল-সৃষ্ট সাহিত্যকর্মে নারীর বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা পরিলক্ষিত।

নজরুল-সাহিত্যের অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নারী। নারী ছাড়া যেন নজরুলের সাহিত্য কল্পনাই করা যায় না। তবে নারী সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও নারীকে তিনি উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন দ্যোতনায়। নারীচরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ-সংসারের অন্দরমহলে ঢোকার চেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন নজরুল। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভীষ্ট লক্ষ্যেও তিনি পৌঁছুতে পেরেছিলেন। নজরুলসৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো নানা বর্ণে বর্ণিল, নানা বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। চরিত্রগুলোর ভেতর-বাইরে নানান রূপ। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার মিশেলে গড়া চরিত্রগুলো যেন আটপৌরে বাঙালি নারীর মূর্ত প্রতীক।

তারুণ্যদীপ্ত নজরুল যখন সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠছিলেন তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসক-শোষকদের আধিপত্য। একজন কবি হিসেবে কেবল রোমান্টিসিজমই নয়, সব অন্যায় বিশেষ করে ব্রিটিশদের দুরাচার জুলুম-নির্যাতন তাঁকে করে তুলেছিল প্রতিবাদ-পরায়ণ। কেবল প্রতিবাদীই হন নি, হয়েছেন বিদ্রোহীও। একদিকে প্রতিবাদ করতে, অন্যদিকে যুদ্ধে যেতেও দ্বিধা করেন নি নজরুল। হয়েছেন মহাবিপ্লবী, মহাবীর। নজরুলসৃষ্ট নারীরা যেন এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো কেবল সংসারকর্মেই পটু নয়, সমরাস্ত্র চালনায়ও সিদ্ধহস্ত।

নজরুলসৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো তাঁর কবিতার মতো সৃষ্টিসুলভ কল্পনাপ্রসূত নয়। জীবনসংগ্রামের আড়ালে-আবডালে ঘটে যাওয়া নানান খণ্ডচিত্রের এক শিল্পিত রূপ হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র। নজরুলের সৃষ্টিকর্মে যেসব নারীর উপস্থিতি আমাদের নতুন চেতনায় প্রাণিত করে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা স্বমহিমা নিয়েই নজরুল-

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছে। নজরুলরচিত কথাসাহিত্যের নানা অংশে নারীর উপস্থিতি এমন সপ্রাণ যে মনে হবে এরা আমাদেরই অংশীভূত। এদের ছাড়া যেন একেকটি পরিবার অকল্পনীয়, সমাজগঠন যেন ছিল সুদূরপরাহত। সেই নিরিখেই বলা যায়, এসব নারী বাঙালি জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নজরুলসৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো সবসময় কেবল প্রিয়া হিসেবেই ধরা দেয় নি। তাঁর সৃষ্টকর্মে নারী-উপস্থিতির ছিল নানান রূপ– নারী কখনও মাতা, কখনও স্ত্রী। আবার কখনও ভগ্নি কিংবা কন্যারূপে পাই তাদের। মূলত নজরুলের নারীবিষয়ক ভাবনায় যে বহুরূপের সংমিশ্রণ ঘটেছিল তা ধরা দিয়েছে নারীচরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে। নিজের বাউন্ডুলে জীবনের নানা প্রেক্ষাপটে নারীর যে ভূমিকা ছিল তা নজরুলসাহিত্যে নানান রূপ আর মাধুর্যের মিশ্রণে বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে তাঁর বারবার নারীর কাছেই ফিরে আসার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নারী যে বেশিরভাগ সময়ই আমাদের চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল তা নজরুল তাঁর লেখনীর মাধ্যমে উচ্চকিত করেছেন। কথাসাহিত্যে তিনি নানা ব্যঞ্জনায় নারীচরিত্র রূপায়ণ করেছেন। বিশদ আলোচনায় সে বিষয়টির স্বরূপ উন্মোচন এ রচনার অন্যতম প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নজরুলের জীবন-কথার আলোকে কথাসাহিত্য রচনার বিবরণ

নজরুল-সাহিত্যকে তাঁর জীবন থেকে কোনোভাবেই পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। তাঁর রচিত একেকটি গল্প, একেকটি উপন্যাস যেন তাঁর নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি সাহিত্যকর্মেই নজরুলের ব্যক্তিজীবনের ছোঁয়া পাই আমরা। জীবন ও সাহিত্যের এই পরিপূরকতার ফলে নজরুলের জীবনকে বিচার করলে যেমন তাঁর সাহিত্যের অনেকখানিই পাওয়া হয়ে যায় ঠিক তেমনই অনুধাবন করা যায় তাঁর রচিত সাহিত্যের নির্যাসই যেন একজন পরিপূর্ণ নজরুল।

আবেগ-উচ্ছল জীবনের পরতে পরতে প্রেমে ভরপুর ছিলেন নজরুল। উচ্ছল আবেগদীপ্ত স্বভাবের প্রভাবে নজরুলের জীবনে এসেছিল একাধিক প্রেম। প্রতিটি প্রেমই ছিল সমহিমায় ভাস্বর। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের যেমন পৃথক অর্থ থাকে তেমনি বিভিন্ন বয়সে পড়া নজরুলের প্রেমেরও পৃথক মানে ছিল। তাঁর প্রতিটি প্রেমই দিয়েছে জীবনের নতুন নতুন বাঁক। নিয়ে গেছে জীবনের নতুন নতুন মোড়ে। আর এই স্বকীয় প্রেমের সুধা পান করে নজরুল হয়ে উঠেছেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, একজন নিখাদ সাহিত্যিক।

কাজী নজরুল ইসলামের গল্প, উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। তিনি তিনটি গল্পগ্রন্থ– *ব্যথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৪), *শিউলিমালা* (১৯৩১) এবং তিনটি উপন্যাস *বাঁধন-হারা* (১৯২৭), *কুহেলিকা* (১৯৩১) ও *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) রচনা করেন। ছোটগল্প ও উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে ব্যক্তি নজরুলের প্রভাব ছিল লক্ষ করার মতো। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি বুঝতে আমরা তাঁর জন্ম থেকে *কুহেলিকা* প্রকাশের কাল অর্থাৎ ১৯৩১ পর্যন্ত সময়টুকু দেখে নেব।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১[illegible] জৈ[illegible]) [illegible] পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার [illegible] মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্র[illegible]।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মা জাহেদা খাতুন। ফকির আহমদের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী জাহেদা খাতুনের গর্ভে ছয় পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। প্রথম পুত্র কাজী সাহেবজান এবং তারপর ক্রমান্বয়ে চারপুত্র মারা যাওয়ার পর নজরুলের জন্ম। পরপর চার পুত্রের মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম যেন জাহেদা খাতুনের কাছে আকাশের চাঁদ প্রাপ্তির মতোই ঘটনা। যারপরনাই খুশি হন জাহেদা। কিন্তু দারিদ্র্যের ভাবনাও ভর করে তার মনে। টানাটানির সংসারে আকাশের ঝলমলে 'চাঁদ' বুঝি এবার মায়ের অভাব আর দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেবে। এজন্যই হয়তো তাঁর নাম হয় দুখু মিঞা।

এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম তাঁর *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি* গ্রন্থে বলেন,

> 'নজরুলের নাম যারা দুখু মিয়া রেখেছিলেন তারা অজান্তে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত মেনে তা করেছিলেন মনে হয়, কারণ এ মানুষটির জীবনে আর যা কিছুরই অভাব হোক দুঃখের অভাব কোনদিন হয়নি।'[১]

মায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল– শান্ত-সুবোধ বালক হবে নজরুল– তবে তেমনটি তিনি হন নি। শৈশবে অত্যন্ত ডানপিটে ছিলেন নজরুল। তার দুরন্তপনায় রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল গ্রামবাসী। তবে তাঁর সেই ডানপিটে ভাব দূর হতে সময় লাগে নি। কারণ মাত্র নয় বছর বয়সে ১৯০৮ সালে নজরুল তাঁর পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার চরম অর্থকষ্টে পড়ে। গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পাস করেন নজরুল। অভাব-অনটনের কারণে মাত্র দশ বছর বয়সেই (১৯০৯) ওই মক্তবে চাকরি নিতে হয় তাঁকে। এ সময় তিনি হাজী পালোয়ানের মাজারে, পীরপুকুরের মসজিদে এবং গ্রামে কাজ করে সংসারের হাল ধরেন। এসব কাজের মাধ্যমে তিনি অল্প বয়সেই ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান, যা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ইসলামী

চেতনার চর্চা শুরু করেছেন বলা যায়। নজরুলের চাচা কাজী বজলে করিম ছিলেন ফারসি সাহিত্যে পণ্ডিত। তিনি কবিতা, গান-গজলের চর্চা করতেন। নজরুল তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে আরবি, ফারসিমিশ্রিত মুসলমানি বাংলায় কাব্যচর্চায় উৎসাহী হন।

বাল্য বয়সেই লোকগানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে *লেটো* (বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল) দলে যোগ দিয়ে শুরু করেন জীবনের নতুন অধ্যায়। তাঁর চাচা কাজী বজলে করিম চুরুলিয়া অঞ্চলের *লেটো* দলের বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন। আগেই বলেছি, আরবি, ফারসি-উর্দুতে তাঁর ছিল বিশেষ দখল। আর সেই দখল তাঁকে দিয়েছিল বিশেষ মহিমা। অনেকটা হুটহাট গান রচনায় বজলে করিম ছিলেন অতি পারঙ্গম। চোখের পলকেই একেকটা গান বাধা হয়ে যেত তাঁর। কিন্তু সৃজনশীল এ শাখায় খুব কাঁচা বয়সেই চাচাকে হারিয়ে সবার নজর কাড়েন দুখু। মাত্র ১২-১৩ বছর বয়সেই বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন নজরুল। মুখে মুখে পদ্য রচনা, গীত রচনা, পালাগান তৈরি ও কবিগান পরিচালনায় অভূতপূর্ব মুন্সিয়ানা দেখান তিনি। শুধু তা-ই নয়, তখন পরিস্থিতি এমন– যেখানেই কবিগান, সেখানেই নজরুল। কবিগানের বিভিন্ন আসরে নিয়মিত অংশ নিতে থাকেন তিনি। মূলত এভাবেই নজরুলের সাহিত্যযাত্রা। *লেটো* দলেই তাঁর সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি। এই দলটির সদস্য হয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন। অন্যদের সঙ্গে মিলে অভিনয় শিখতেন। লিখতেন নাটকের জন্য গান আর কবিতা।

অব্যবহিত এই সময় নজরুলের সাহিত্যজীবনের নতুন পটভূমির জন্ম হয়। নিজ কর্মকাণ্ড আর অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি শুরু করেন সাহিত্যচর্চা। এই চর্চার মাধ্যম হিসেবে নজরুল বেছে নেন বাংলা এবং সংস্কৃতকে। পাশাপাশি পৌরাণিক কাহিনিসমূহও আত্মস্থ করতে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর বিষয়-আশয় চলে আসে তাঁর দখলে। ইসলামী পৌরাণিক কাহিনিও বাদ যায় নি। একদিকে মসজিদ, মাজার ও মক্তবজীবন আর

অন্যদিকে লেটো দলের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা নজরুলকে দিয়েছিল নতুন পথের সন্ধান। অল্প বয়সেই তিনি নাট্যদলের জন্য রচনা করেন বেশকিছু পালাগান। অনবদ্য সেই সৃষ্টির মধ্যে *চাষার সঙ*, *শকুনীবধ*, *আকবর বাদশাহ*, *কবি কালিদাস*, *মেঘনাদবধ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ সালে নজরুল লেটো দল ছেড়ে ছাত্রজীবনে ফিরে আসেন। নতুন ছাত্রজীবনে তাঁর প্রথম স্কুল ছিল রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল। এখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। এরপর ভর্তি হন মাথরুন হাইস্কুলে। এটি পরবর্তীতে মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিতি লাভ করে। ওই স্কুলে নজরুল দুবছর পড়াশোনা করেন। মাথরুন স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক যিনি সেকালের বিখ্যাত কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তার সান্নিধ্য নজরুলের অনুপ্রেরণার একটি উৎস।
কুমুদরঞ্জন মল্লিক আজহারউদ্দীনের কাছে লেখা এক চিঠিতে নজরুল সম্পর্কে বলেন–

> 'আমি ২৩ বৎসর বয়সে মাথরুন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি। ...তখনকার দিনে 6th Class-এ নজরুল পড়িত। ছোট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই আসিয়া প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম। সে বড় লাজুক ছিল'[২]

আমরা জানি, আর্থিক সমস্যা নজরুলকে বেশি দিন সেখানে পড়াশোনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তাঁকে আবার কাজে ফিরে যেতে হয়। প্রথমে যোগ দেন বাসুদেবের কবিদলে। এরপর একজন খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা এবং সবশেষে আসানসোলের চা-রুটির দোকানে রুটি বানানোর কাজ নেন। এভাবে বেশ কষ্টের মাঝেই নজরুলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এই দোকানে কাজ করার

Dhaka University Institutional Repository

সময় আসানসোলের দারোগা কাজী রফিজউদ্দিন আহমদের (মতান্তরে রফিজউল্লাহ) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দোকানে একা একা বসে নজরুল যেসব কবিতা ও ছড়া রচনা করতেন তা দেখে দারোগা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পান। তিনিই নজরুলকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। ছাত্র হিসেবে নজরুল ছিলেন মেধাবী ও মনোযোগী। তবে স্কুলের ধরাবাঁধা জীবন নজরুলের কাছে ছিল অনেকটাই অসহনীয়।

কাজীর সিমলা এলাকা থেকে দরিরামপুর স্কুলের দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ মাইল। স্কুলে যাওয়ার সময় গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা নজরুলকে খুবই জ্বালাতন করত। তাঁর জীবনের এই বাস্তবদিক প্রস্ফুটিত হয় '*শিউলিমালা*' গল্পগ্রন্থের '*অগ্নি-গিরি*' গল্পের সবুর চরিত্রে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর কাউকে কিছু না জানিয়ে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন তিনি। তবে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আবার রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে ফিরে যান। সেখানে অষ্টম শ্রেণি থেকে পড়াশোনা শুরু করেন নজরুল।

এখানে তিনি সিয়ারসোল রাজবাড়ী থেকে মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পেতেন। ওই স্কুলের ফারসি শিক্ষক হাফিজ নূরুন্নবী নজরুলকে সংস্কৃতের বদলে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ফারসি নিতে উৎসাহিত করেন। নজরুলের ফারসি জ্ঞানে এই শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। এই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবোদ্ধা সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের সাহচর্যে নজরুলের মধ্যে তীব্র সঙ্গীতানুরাগ সৃষ্টি হয়। একই স্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক নজরুলের মধ্যে স্বাধীনতা ও নবতর বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার সঞ্চারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে পড়াশোনা করার সময়ই নজরুলের সঙ্গে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। ১৯১৭ সাল অর্থাৎ দশম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন নজরুল। ওই স্কুলে অধ্যয়নকালে সেখানকার চারজন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন নজরুল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী চেতনা বিশিষ্ট নিবারণচন্দ্র ঘটক ও ফারসি সাহিত্যের হাফিজ নূরুন্নবী ছাড়াও নজরুল আন্তরিক স্নেহসিক্ত হয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।[৩]

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় বাঙালি যুবকদের মধ্য থেকে সৈনিক নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন গঠনের উদ্যোগ নেয়। সেই সঙ্গে সৈনিক দলে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সৈনিক সংগ্রহের চেষ্টা চালায়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন নজরুল। প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এবং পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য লাহোর হয়ে পেশোয়ারের নৌশেরায় যান। তিন মাস প্রশিক্ষণ-শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক কর্পোরাল থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। ওই রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবির কাছে তিনি ফারসি ভাষা শিখেন। এ ছাড়া সহসৈনিকদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রাখেন। আর গদ্য-পদ্যের চর্চাও চলতে থাকে একই সঙ্গে।

করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল যে রচনাগুলো সম্পন্ন করেন তার মধ্যে রয়েছে– *বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী* (প্রথম গদ্য রচনা), *মুক্তি* (প্রথম প্রকাশিত কবিতা); গল্পের মধ্যে রয়েছে– *হেনা*, *ব্যথার দান*, *মেহের নেগার*, *ঘুমের ঘোরে*, *কবিতা সমাধি* ইত্যাদি। *রিক্তের বেদন* গ্রন্থের গল্পগুলি এই করাচি সেনানিবাসে বসেই রচনা করেন। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় হেনা* ও *ব্যথার দান* গল্প দুটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা *ব্যথার দান* গল্পটিতে এর আগের বছর সংঘটিত হওয়া রুশ বিপ্লবের প্রভাব রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, করাচিতে থাকলেও নজরুল কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁর কাছে যেসব পত্রিকা নিয়মিত যেত তার মধ্যে *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *ভারতী*, *মানসী*, *মর্মবাণী*, *সবুজপত্র*, *সওগাত*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফারসি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। এ সূত্রে বলা যায়, নজরুলের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি করাচি সেনানিবাসেই।

বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য বাঙালি পল্টন গঠন করা হয়। তবে এরই মধ্যে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধ চলার সময় নজরুলের বাহিনীর ইরাক যাবার কথা থাকলেও যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় তা আর হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মার্চে তা পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

করাচি ছেড়ে নজরুল প্রথমে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং পরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে ওঠেন। এখানে তিনি মুজফ্‌ফর আহমদের সাথে একই

কক্ষে থাকতেন। এই বাড়িতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আফজাল-উল হক, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ সাহিত্যিক ও সংগঠকেরা এই বাড়িতে থাকতেন।[৪] এখানেই নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় নজরুল গায়ক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে থাকার ব্যবস্থা হওয়ার পর নজরুল সাত-আট দিনের জন্য চুরুলিয়ায় গ্রামের বাড়িতে মায়ের সাথে দেখা করতে যান। এই সময় মায়ের সাথে অজানা কোনো এক কারণে মান-অভিমানের ঘটনা ঘটে। এরপর মা জীবিত থাকা অবস্থায় নজরুল আর চুরুলিয়ায় যান নি, এমনকী মায়ের মৃত্যুসংবাদ শোনার পরও না।

কলকাতায় এসে নজরুল কোনো সরকারি চাকরি না নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। প্রথমে সান্ধ্যদৈনিক *নবযুগ* (১৯২০), পরে অর্ধসাপ্তাহিক *ধূমকেতু* (১৯২২) পত্রিকায় যোগ দেন তিনি । এ সময় ওই পত্রিকা দুটি ছাড়াও *মোসলেম ভারত*, *প্রবাসী*, *সাধনা*, *বিজলী*সহ অন্যান্য পত্রিকাতে নজরুলের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। করাচি থাকাকালীন রচিত নজরুলের পত্রোপন্যাস *বাঁধনহারা* মোসলেম ভারত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা [বৈশাখ, ১৩২৭ (১৯২০)] থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯২০ সালে নজরুল *নবযুগ* ছেড়ে দেওঘর চলে যান। তবে সেখানে তাঁর পক্ষে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয় নি। সেখানে তাঁর বন্ধুও কেউ ছিল না। তা ছাড়া ছিল অর্থকষ্ট ও থাকাখাওয়ার সমস্যা। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর ছাত্রবন্ধু ইমদাদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে দেওঘর যান। সেখান থেকে নজরুলকে তিনি কলকাতায় নিয়ে আসেন। নজরুলের কলকাতায় আসার খবর পেয়ে আফজাল-উল হক (*মোসলেম ভারত* সম্পাদক মোজাম্মেল হকের ছেলে) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। এ সময় আফজাল নজরুলের ভরণপোষণ চালাবেন এমন আশ্বাস দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। নজরুল

সাহিত্য সমিতির অফিসে আফজাল-উল হকের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। এখানে ছোটদের পাঠ্যবইয়ের প্রকাশক আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় হয়। আর্থিক ও মানসিক টানাপড়েনের সুযোগে নজরুলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন আলী আকবর। তাঁর লক্ষ্য ছিল নজরুলকে দিয়ে স্কুলের পাঠ্যবই লেখানো। এই মতলবে তিনি নজরুলকে তদানীন্তন ত্রিপুরার (বর্তমান কুমিল্লা) দৌলতপুর নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পথে কান্দিরপাড়ে আলী আকবরের বন্ধু বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে যাত্রাবিরতি করেন। সংগীত ও সাহিত্যানুরাগী এই পরিবারে নজরুল সমাদৃত হন। বীরেন্দ্রকুমারের মা বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল মা এবং বীরেন্দ্রর জেঠিমা গিরিবালা দেবীকে মাসিমা ডাকেন। এখানে নজরুলের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পত্নী ইন্দ্রকুমারের অগ্রজ বসন্ত সেনগুপ্তের কন্যা তের বছরের স্কুলছাত্রী আশালতা সেনগুপ্তের প্রথম দেখা হয়।

কবি-খ্যাতির দীপ্যমান পরিসরে কয়েকজন অনন্ত স্নেহময়ী নারীর সান্নিধ্য ১৯২০-এর দশকে নজরুলকে দেয় নতুন রূপ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনজন হলেন : বিরজাসুন্দরী দেবী, মিসেস এম. রহমান, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী। এঁদের তিনজনকেই নজরুল বিভিন্ন সময়ে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট কিন্তু টগবগে তারুণ্যদীপ্ত নজরুল খুঁজে পান জীবনের নতুন মানে। জীবনকে নতুন করে দেখার সেই শক্তি অবশ্যই প্রেমের, ভালোবাসার এবং স্নেহের।

সদ্য যৌবনে পা দেওয়া নজরুল সৈয়দা খাতুন (পরে নজরুলের দেওয়া নাম নার্গিস) নামের যে নারীকে স্বপ্নকন্যা হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে পণ্ডিতদের নানা ভাষ্য পাওয়া যায়। তবে এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, কুমিল্লার নার্গিস নজরুলের জীবনে যে আলোকচ্ছটা বয়ে এনেছিলেন তা নজরুলের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা হয়ে রয়েছিল আমৃত্যু। নজরুল আর নার্গিসের বিয়ে নিয়ে মতদ্বৈধতা

থাকলেও তাঁদের প্রণয়কে অনেকেই বিচার করেছেন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। কারণ নার্গিসই নজরুলের প্রথম প্রেম।

১৯২১ সালের ৫ এপ্রিল আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল দৌলতপুরের বাড়িতে আসেন। এখানে প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেন তিনি। শেষপর্যন্ত এখান থেকে তাঁকে এমন এক যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে হয়েছে যা তাকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আলী আকবর খানের বড় ভাইয়ের মেয়ে আম্বিয়া খানমের সঙ্গে আলী আকবরের ভাগিনা আবদুল জব্বারের বিয়ের অনুষ্ঠানে নজরুল উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আলী আকবরের অগ্রজা আসমাতুন্নেসার কন্যা সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল নার্গিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি দৌলতপুরেই নার্গিসকে নিয়ে অনেকগুলো কবিতা ও গান লেখেন। *ছায়ানট* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই যেমন : বেদনা-অভিমান, অ-বেলায়, হার-মানা-হার, অনাদৃতা, হারা-মণি, মানস-বধূ, বিদায়-বেলায়, বিধুরা পথিক-প্রিয়া ইত্যাদি নার্গিসকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। পরিচয়ের অল্প কিছুদিন পরই নজরুল ও নার্গিসের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। নজরুলের নেওয়া আকস্মিক এ সিদ্ধান্তে সাহিত্যিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ সংবাদে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলকে এক পত্রে লেখেন−

> ‘তোর বয়স আমার চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ, feeling− এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশি। কাজেই ভয় হয় যে, হয়তো বা দুটা জীবনই ব্যর্থ হয়।’[৫]

কলকাতা থেকে নজরুলের কোনো বন্ধুই এ বিয়েতে যোগ দেন নি। তবে কুমিল্লার কান্দিরপাড় থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত পরিবারের সবাই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু

বিয়ের দিন আলী আকবর খানের অন্যায় বৈবাহিক শর্তে নজরুল ক্ষুব্ধ হয়ে বিয়ের পরদিনই বীরেন্দ্র কুমারদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে কান্দিরপাড় চলে আসেন। এখানে নজরুল প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। বীরেন্দ্র দে'র পরিবারের আন্তরিক সাহচর্যে নজরুল নার্গিসের স্মৃতি ভুলতে সচেষ্ট হন। এই সময়েই নজরুল গিরিবালা দেবীর কন্যা আশালতার প্রতি কিছুটা অনুরক্ত হয়ে পড়েন। নজরুল-নার্গিসের বিয়ে ভাঙার ঘটনাকে অনেক সমালোচক সেনগুপ্ত পরিবারের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস বলে উল্লেখ করেছেন।
এ প্রসঙ্গে মোবাশ্বের আলী তাঁর *নজরুল ও তিন নারী* গ্রন্থে বলেন–

> 'এঁর মূলে রয়েছে তাঁদের হীন স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস। তাই নজরুলকে কুমিল্লায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় ও প্রশয় দিয়েছেন– পিতৃহারা উদ্ভিন্নযৌবনা প্রমীলার একটা গতি করার জন্যে। এবং পরিশেষে তাঁদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে, তবে সময় লেগেছে তিন বছর।'[৬]

প্রমীলার সঙ্গে বিয়েতেও নজরুলকে কম ঝামেলা পোহাতে হয় নি। তাঁদের বিয়েতে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত রাজি ছিলেন না। ইন্দ্রকুমারের ছেলে বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত ছিলেন এ বিয়ের ঘোরতর বিরোধী। তিনি প্রকাশ্যেই এ বিয়ের বিরোধিতা করেন। বিরোধিতার মাত্রা এতই বেশি ছিল যে তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দিতেও কার্পণ্য করেন নি। বীরেন্দ্র কুমার বিয়ে আটকাতে না পেরে বললেন, নজরুলকে 'হয় শুদ্ধিগ্রহণ নয় ব্রাহ্মমতে বিবাহকার্য' সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এর কোনটিতেই রাজি হন নি নজরুল। হিন্দু-মুসলমান কোনো সমাজই এ বিয়ে মেনে নিতে পারে নি। মুসলমান সমাজের কেউ কেউ নজরুলকে 'কাফের' বলে ফতোয়া জারি করে। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নি ব্রাহ্মসমাজের সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং প্রবাসী পত্রিকা গোষ্ঠী এ বিষয়ে লেখালেখি করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গিরিবালা দেবী কন্যা প্রমীলাকে নিয়ে বিহারের সমস্তিপুরে ভাইদের কাছে চলে যান। কোনভাবেই যখন বিয়ে

হচ্ছিল না তখন নজরুল-প্রমীলার বিয়ের বন্দোবস্তে এগিয়ে আসেন হুগলির সরকারি উকিল খান বাহাদুর মজহারুল আনোয়ার চৌধুরীর কন্যা মিসেস এম. রহমান। নজরুল তাঁকে মা বলে ডাকতেন। মিসেস এম. রহমান নিজ দায়িত্বে ১৯২৪ সালে নজরুল-প্রমীলার বিয়ে দেন। বিয়ের সময় একদিকে প্রমীলা অপ্রাপ্তবয়স্ক অনদিকে ধর্মান্তরিত হওয়া নিয়ে নজরুলের 'গোঁ-ধরা' নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। নজরুল নিজেও ধর্মত্যাগ করবেন না আবার প্রমীলা মুসলিম হবেন তাও চান না তিনি। শেষপর্যন্ত 'আহেলে কেতাব'[৭] অনুসারে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়েতে মা গিরিবালা দেবী ছাড়া প্রমীলার কোনো আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিল না।

বিয়েকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নজরুলের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠলে মিসেস এম. রহমান তাঁদেরকে হুগলিতে নিয়ে আসেন। পরে নজরুল-প্রমীলা দম্পতির জন্য পৃথক বাসা ভাড়া নিয়ে দেন। কিন্তু হুগলিতে নজরুলের বেশিদিন থাকা সম্ভব হয় নি। অসুস্থতার পাশাপাশি আর্থিক সংকট নজরুলের জীবনকে বিষাদময় করে তোলে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে হেমন্তকুমার সরকার কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান। হেমন্তকুমারের সাহচর্যে নজরুল কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝোঁকেন। কৃষ্ণনগরে তিনি চাঁদ সড়ক এলাকার একটি বাংলোতে ওঠেন। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস এই বাড়ি ও তার পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত। মোটামুটি একই বছরে, একই এলাকায় অবস্থানকালে *মৃত্যুক্ষুধা* ও *কুহেলিকা* উপন্যাস রচনা করেন নজরুল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা আসেন নজরুল। প্রায় তিন সপ্তাহ থাকেন ঢাকায় অবস্থান করেন তিনি। সম্মেলন শেষে নজরুল কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউসের (বর্তমানে বাংলা একাডেমি) বাসায় উঠেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের মেধাবী ছাত্রী ফজিলতুন

নেসার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। ফজিলতুনের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নজরুল তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তবে বারবার চেষ্টা করেও নজরুল ফজিলতুনের মন পেতে ব্যর্থ হন। এ সময় তাঁকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো গান ও কবিতা রচনা করেন। বিয়ের মাত্র বছর চারেকের মাথায় পরনারীর প্রতি নজরুলের টান আঁচ করতে পারেন প্রমীলা। স্বাভাবিকভাবেই এতে তিনি মর্মপীড়ার পাশাপাশি শঙ্কিতও হন। বেদনায় নিজের হৃদয় বিদ্ধ হলেও নজরুলকে তা বুঝতে দেন নি প্রমীলা।

১৯৩৯ সালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে প্রমীলার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। রোগ সারাবার জন্য নজরুল প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করেন। কিন্তু কিছুতেই প্রমীলা শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক হয় নি। এরই মধ্যে ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিজে অসুস্থ থাকলেও প্রমীলা নজরুলের সেবা-শুশ্রূষা করেন নিজ হাতে।

নিয়তির লীলায় দুখু মিয়ার জীবনে কখনোই সেই অর্থে বৈবাহিক সুখ মেলে নি। জীবনে তিনজন নারীর সঙ্গে প্রেম-পরিণয়ে হৃদয়ের লেনদেন ঘটে নজরুলের। কিন্তু কোনোটিতেই তাঁর বুকের অজানা হাহাকার যেন দমাতে পারে নি। কোনো সম্পর্কই নজরুলকে পুরোপুরি সুখী করতে পারে নি। নজরুলের জীবনে প্রথম প্রেম আসে ২২ বছর বয়সে। অনিন্দ্য সুন্দরী নার্গিস নজরুলের দীপ্ত যৌবনের দরজায় কড়া নাড়ে। প্রেমে পড়ার মাত্র একমাসের মাথায়ই বিয়ে করতে গিয়ে রীতিমতো হোঁচট খান নজরুল। অনেকটা অজ্ঞাত কারণে বিয়ের আসর থেকে চলে যান তিনি। সেই দুঃখ নজরুলকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সারাজীবন। ওই ঘটনার প্রায় ১৬ বছর পর ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই তিনি নার্গিসের একটি চিঠির জবাবে লেখেন–

'তোমার আজিকার রূপ কি, জানিনা। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবী মূর্তির মত আমার হৃদয়বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী পীঠ। ...জীবনভরে সেখানেই চলেছে আমার পূজা আরতি।'[৮]

প্রমীলার মাঝে নিজের সুখের ঠিকানা খুঁজতে গিয়েও নানা কারণে বাধাগ্রস্ত হন নজরুল। আর্থিক, সামাজিক আর রাজনৈতিকসহ নানান সংকট দুর্বিষহ করে তোলে নজরুলের দাম্পত্য জীবন। প্রমীলাকে পেয়েও পরনারীর প্রতি টান দেখা যায় তাঁর মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের মেধাবী ছাত্রী ফজিলতুন নেসার সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর তাঁর ব্যক্তিত্ব আর মেধা প্রেমের দিকে ধাবিত করে নজরুলকে। কিন্তু সেখান থেকেও রিক্ত হাতে ফিরতে হয় আজন্ম প্রেমের পূজারি এই কবিকে। বারবার প্রেমে পড়া, বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়া, বঞ্চিত হওয়া নজরুলের জীবনে এনে দেয় বিশেষ এক শূন্যতা– যাকে বলা হয় বিরহ। আর সেই বিরহ বা না পাওয়ার বেদনায় সিক্ত কবিহৃদয় ভরে ওঠে প্রেমময় ছন্দে। একে একে রচনা করতে থাকেন বিখ্যাত সব গান আর কবিতা। মূলত নজরুলের জীবনে আসা তিনজন নারীর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অসংখ্য প্রমাণ মেলে এসব কবিতা ও গানে। নার্গিস, প্রমীলা ও ফজিলতুন নেসার প্রতি নজরুলের যে টান বা আবেগ ছিল তা ফুটে ওঠে নজরুলসৃষ্ট সাহিত্যকর্মে। সেসব সাহিত্যকর্মে ওই তিন নারীর প্রভাব অতিমাত্রায় স্পষ্ট।

নজরুলের পরিচয় মূলত কবি হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর যাত্রা শুরু হয় গদ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি গল্প সংকলন। *ব্যথার দান* নামে এ গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

ধূমকেতু পত্রিকায় ১৯২২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় *আনন্দময়ীর আগমনে* কবিতা। এটি রচনার জন্য নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি। প্রায় এক বছর কারাভোগ করে মুক্তি পান একই বছরের ১৫ ডিসেম্বর। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরপরই নজরুল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এর প্রভাব আমরা তাঁর *কুহেলিকা* ও *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে দেখতে পাই।

১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *রিক্তের বেদন* প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ প্রকাশের আগেই কবি হিসেবে নজরুলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকাশিত হয়ে গেছে *অগ্নি-বীণা* (অক্টোবর ১৯২২), *দোলনচাঁপা* (অক্টোবর ১৯২৩), *বিষের বাঁশী* (আগস্ট ১৯২৪), *ভাঙ্গার গান* (আগস্ট ১৯২৪)।

'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেই নজরুল বিখ্যাত হয়ে যান। 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখে কারাবরণ করার কারণে তিনি তখন থেকেই সকলের কাছে কবি হিসেবে পরিচিতি পান। নজরুল প্রধানত কবি এবং সংগীত রচয়িতা হওয়ায় হয়তো সে সময়ে নজরুলের কথাসাহিত্য খুব বেশি আলোচনায় আসে নি।

১৯২৭ সালে মোহাম্মদ আফজাল্-উল হকের সম্পাদনায় মাসিক *নওরোজ* প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। এই পত্রিকায় *কুহেলিকা* উপন্যাসের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাঁচ সংখ্যা বের হবার পর নওরোজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় *কুহেলিকা* সাপ্তাহিক *সওগাতে* প্রকাশিত হয়। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসও সওগাতে প্রকাশিত হয়। অবশ্য গ্রন্থাকারে *মৃত্যুক্ষুধা* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে। আর *কুহেলিকা* ১৯৩১-এর জুন মাসে। কিন্তু *কুহেলিকাই* *নওরোজ* পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হতে থাকে। *কুহেলিকার* পাঁচ মাস পরে

সওগাত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ *শিউলিমালা* প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এর অক্টোবর মাসে। এরপর বাকরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত (১৯৪২) তিনি আর গল্প বা উপন্যাস লিখেন নি।

নজরুল-রচিত অন্যান্য সাহিত্যকর্ম হলো *ছায়ানট* (১৯২৫?), *পূবের হাওয়া* (১৯২৫), *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *চিত্তনামা* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৬), *ফণিমনসা* (১৯২৭), *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৯২৭), *জিঞ্জির* (১৯২৮), *সঞ্চিতা* (১৯২৮), *চক্রবাক* (১৯২৯), *সন্ধ্যা* (১৯২৯), *প্রলয় শিখা* (১৯৩০), *নির্ঝর* (১৯৩৮), *নতুন চাঁদ* (১৯৪৫), *মরু-ভাস্কর* (১৯৫৭), *শেষ সওগাত* (১৯৫৮), *ঝড়* (১৯৬০), *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* (১৯৩০), *কাব্য আমপারা* (১৯৩৩), *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* (১৯৬০), *ঝিঙেফুল* (১৯২৬), *সঞ্চয়ন* (১৯৫৫), *পিলে পট্‌কা পুতুলের বিয়ে* (১৯৬৩), *ঘুমজাগানো পাখি* (১৯৬৪) এবং *ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসি* (১৯৬৫)। এ ছাড়াও *ঝিলিমিলি* (১৯৩০), *আলেয়া* (১৯৩১), *মধুমালা* (১৯৫৯), *পুতুলের বিয়ে* (১৯৩৩) নামে চারটি নাটক এবং পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থ *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৫), *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬) এবং *ধূমকেতু* (১৯৬০)-সহ ১৫টি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছেন নজরুল। এর মধ্যে *চোখের চাতক* (১৯২৯), *মহুয়ার গান* (১৯৩০), *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১), *জুলফিকার* (১৯৩২), *বন-গীতি* (১৯৩২) এবং *গুল-বাগিচা* (১৯৩৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৮

২. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭

৩. মাহবুবুল হক, *নজরুল তারিখ অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১০, পৃষ্ঠা-৫

৪. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৪

৫. মাহবুবুল হক, *নজরুল তারিখ অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১০, পৃষ্ঠা-২১

৬. মোবাশ্বের আলী, *নজরুল ও তিন নারী*, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা-২০

৭. প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগ্রন্থ অনুসারী

৮. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুলের পত্রাবলী*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের গল্পে নারীচরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল-কাব্যের প্রধান বিষয় বিদ্রোহ ও প্রেম। তাঁর ছোটগল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। প্রথম গল্পগ্রন্থ *ব্যথার দান*-এ মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি হচ্ছে– *ব্যথার দান*, *হেনা*, *বাদল-বরিষণে*, *ঘুমের ঘোরে*, *অতৃপ্ত কামনা* ও *রাজবন্দীর চিঠি*। তাঁর সেনাজীবনের অভিজ্ঞতা আর রোমান্টিক মনের বিচিত্রভাব প্রকাশ পেয়েছে গল্পগুলিতে।

ব্যথার দান গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে দারা, বেদৌরা এবং সয়ফুল্-মুলকের আবেগময় স্বগতকথনে। প্রেম শাশ্বত, প্রেমের কাছে কামনা সবসময় পরাজিত, এ ধ্রুব সত্যকেই এ গল্পে নজরুল প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নারীরা যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে অনুগত তেমনি আবার কখনো কখনো প্রহেলিকাও বটে। বেদৌরাকে আমরা যেমন দারার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমী হিসেবে পাই তেমনি আবার সয়ফুল্-মুলককে ভালো না বেসেও তাকে দেহ দান করতে দেখি। এখানে নারীর দ্বৈতরূপ প্রকটিত।

ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প *হেনা*। এ গল্পের নায়ক সোহ্‌রাবের মুখে হেনা ও সোহ্‌রাবের প্রণয়কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের ঘটনাস্থল বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তান। সোহ্‌রাব আফগান হয়েও পরদেশির জীবনযাপন করে বেড়াচ্ছিল, তাই হেনা তাকে ভালোবেসেও এতদিন বলে নি। কিন্তু সোহ্‌রাব যখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন সে আর চুপ থাকতে পারে নি। নজরুল এখানে মেয়েদের মনকে মস্ত হেঁয়ালি বলে চিহ্নিত করেছেন।

ব্যথার দান ও *হেনা* গল্প দুটো নজরুল সৈনিক-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন। প্রেমের ব্যর্থতাই গল্প দুটোর মূল উপজীব্য।

বাদল-বরিষণে গল্পটি এক প্রবাসীর প্রেমের কাহিনি। গল্পের নায়িকা কৃষ্ণকায় কাজরিয়ার নিজের রূপ নিয়ে দ্বিধা এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যুবরণ গল্পটির কাহিনি।

ঘুমের ঘোরে গল্পে আজ্হার ও পরীর স্বগত-উক্তিতে গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত। এ গল্পেও নজরুল দেহাতীত প্রেমের কথাই বলেছেন এবং প্রেমের সার্থকতা দেখেছেন, মিলনে নয় বিরহে। পরীকে ভালোবাসলেও আজ্হার পরীকে বিয়ে করে নি। অন্যদিকে পরী একজনের স্ত্রী হয়েও আজ্হারকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। একদিকে হৃদয়ের চাওয়া অন্যদিকে সমাজ-সংসার– এই দ্বৈত অনুভবে পরীচরিত্রে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নরনারীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে গল্পটিতে।

অতৃপ্ত কামনা গল্পেও পেয়ে হারানোর বেদনা ফুটে উঠেছে। বাল্যকালের সাথী মোতিকে মনেপ্রাণে ভালোবাসলেও দারিদ্র্যের কথা ভেবে তাকে ফিরিয়ে দেয়। এ জন্য নায়ককে সারাজীবন আফসোস করতে হয়।

রাজবন্দীর চিঠি গল্পটিও এক ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মকথন। গল্পের নায়ক প্রেসিডেন্সি জেল, কলকাতা থেকে তার মানসীকে চিঠি লিখেছে। এবং তাতেই গল্পের সমস্ত বক্তব্য নিহিত।

দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *রিক্তের বেদন*-এ মোট গল্প আটটি। প্রথম গল্প *রিক্তের বেদন* যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। এ গল্পের নায়ক যুবক হাসিন শহিদার প্রেমকে উপেক্ষা করে যুদ্ধে গিয়ে সেখানে এক বেদুইন রমণী গুলের প্রেমভাজন হয়ে পড়ে। গল্পের শেষে গুল একজন সৈনিককে হত্যা করে তার রাইফেল নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে হাসিনই গুলকে হত্যা করে। হাসিন গুলকে ভালোবাসলেও শেষপর্যন্ত সৈনিকের কর্তব্যবোধের কাছে তার ভালোবাসার মৃত্যু ঘটে। কারণ গুল ছিল প্রতারক। এ গল্পে দুজন নারীর ভালোবাসার দুটি

রূপ দেখানো হয়েছে। শহিদা হাসিনকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। কিন্তু গুলের ভালোবাসায় ছিল প্রতারণার মিশ্রণ।

*বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী*র নায়ক বাঙালি পল্টনের এক বওয়াটে যুবক। ঊনিশ বছর বয়সে সে বিয়ে করে তেরো বছরের কিশোরী রাবেয়াকে। রাবেয়ার মৃত্যুশোকে সে বাউণ্ডুলে হয়ে যায়। পরে সকিনাকে বিয়ে করে বাঁচতে চায়। কিন্তু সকিনাও শেষপর্যন্ত মারা যায়। এর ছয়মাস পর তার মা-ও মারা যায়। পরিশেষে সে পল্টনে যোগ দেয় এবং বাগদাদে তার মৃত্যু ঘটে। নারী কোমল, নারী বেঁচে থাকার প্রেরণা। কিন্তু তার জীবনের তিন নারী– মা এবং দুই স্ত্রী একে একে মরে গিয়ে তাকেও যেন মৃত্যুদেশে যেতে প্ররোচিত করে। অনেকে মনে করেন, এই গল্পে নজরুলের ব্যক্তিজীবনের সামান্য হলেও প্রভাব আছে।

মেহের-নেগার গল্পে ওয়াজিরিস্তানের ভবঘুরে যুবক য়ুসোফ খাঁর সঙ্গে গুলশানের বিয়োগান্তক প্রণয়কাহিনি কাব্যময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। গল্পের নায়ক য়ুসোফ তার স্বপ্নপ্রিয়া মেহের-নেগারকে খুঁজতে এসে ঝিলম নদীর তীরে গুলশানের দেখা পায়। কিন্তু গুলশানের জন্মপরিচয় তাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং এ বেদনা সইতে না পেরে গুলশান আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

সাঁঝের তারা গল্পে তারার সঙ্গে একটি কল্পনাপ্রবণ মনের বিচিত্র চিন্তা রূপায়িত হয়েছে। একে পুরোপুরি গল্প না বলে কথিকা বলা যায়।

রাক্ষুসী গল্পে বিন্দি নামে এক নারীর জীবনযন্ত্রণার কাহিনি বিধৃত হয়েছে। অন্য নারীতে আসক্ত হওয়ায় স্বামীকে হত্যা করে বিন্দি। যে স্বামীকে সে দেবতার মতো পূজা করতো

Dhaka University Institutional Repository

তাকেই খুন করতে হলো নরক থেকে রক্ষা করার জন্য। বিন্দি নিশ্চিত জানে সে অন্যায় কিছু করে নি। এ গল্পে নারীর প্রতিবাদী চরিত্রই প্রকটিত হয়েছে।

স্বামীহারা গল্পে এক বিধবা রমণী তার যন্ত্রণাকাতর জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন। গল্পের নায়িকা বেগম-এর সাথে শিক্ষিত ছেলে আজিজ-এর বিয়ে হয়। কলেরা রোগীর সেবা করতে গিয়ে আজিজ নিজেও কলেরায় মারা যায়। এই মৃত্যুর জন্য প্রতিবেশীরা বেগমকে দায়ী করে। সমাজের দেওয়া এ অপবাদ-অপমান সইতে না পেরে বেগম ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এ গল্পে একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের কাহিনির পাশাপাশি সমাজচেতনা এবং নারীমনস্তত্ত্বও উঠে এসেছে।

সালেক ও *দুরন্ত পথিক* গল্প দুটিতে কথিকার প্রভাব আছে। *দুরন্ত পথিক*কে লেখক নিজেই কথিকা বলে উল্লেখ করেছেন। এ দুটি গল্পে দার্শনিকতত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের শেষ গল্পগ্রন্থ *শিউলিমালা*। এ গ্রন্থে মোট চারটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো হলো *পদ্ম-গোখ্‌রো*, *জিনের বাদ্‌শা*, *অগ্নি-গিরি* এবং *শিউলিমালা*।

নজরুলের গল্পসম্ভারে *পদ্ম-গোখ্‌রো* একটি বিখ্যাত গল্প। একটি পল্লি-উপকথাকে উপজীব্য করে তিনি এ গল্পটি রচনা করেন। গল্পের নায়িকা সন্তানহারা জোহরা দুটো সাপকে ভালোবেসে তার অপূরণীয় বাৎসল্য-স্নেহকে পূরণ করতে চায়। গল্পটিতে মাতৃত্বের শাশ্বত রূপ উঠে এসেছে।

জিনের বাদ্‌শা গল্পটি কিছুটা আখ্যানধর্মী। চান্ ভানুকে পাবার জন্য আল্লা-রাখা'র নানা অপকৌশলের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এ গল্পের কাহিনি প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত চান্

ভানুকে পায় না আল্লা-রাখা। গল্পটিতে হাস্যরসের প্রাধান্য থাকলেও শেষে করুণরসই প্রধান হয়ে ওঠে।

অগ্নি-গিরি গল্পটিতে নায়ক সবুর আখন্দ শান্তশিষ্ট ও নরম প্রকৃতির বলে গ্রামের দুরন্ত ছেলের তাকে প্রতিদিন অন্যায়ভাবে উত্যক্ত করতো। শেষে নূরজাহানের প্রেমের শক্তিতে কীভাবে তার পৌরুষ জেগে ওঠে তা-ই দেখানো হয়েছে এ গল্পে। নজরুল যখন দরিরামপুর হাইস্কুলে পড়তেন সেসময়ের কিছুটা ছায়াপাত আছে এ গল্পে।

শিউলিমালা গল্পগ্রন্থের নামগল্প *শিউলিমালা*। এটি এ গ্রন্থের শেষ গল্প। আজাহার নামে এক তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে শিউলির বিয়োগান্তক প্রণয়কাহিনি গল্পের উপজীব্য। গল্পটি নজরুলের রোমান্টিক চিন্তাচেতনার ফসল। অনেকে মনে করেন গল্পটিতে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নজরুলের ঢাকা সফরের কিছুটা ছাপ আছে।

নজরুলের ছোটগল্পের মুখ্য বিষয়ই হচ্ছে প্রেম। এবং প্রায় প্রতিটি গল্পেই ব্যর্থ প্রেমের গভীর বেদনা স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ গল্পের নায়ক চরিত্রের সাথে ব্যক্তি নজরুলের বাস্তব-জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিষয়ের অভিনবত্বে, শব্দনির্বাচনে, কবিত্বময় ভাষা-ব্যবহারের কারণে তাঁর গল্পগুলোর মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। নজরুলের ছোটগল্প সম্পর্কে গবেষক আতোয়ার রহমান তাঁর *নজরুলের গল্প ও উপন্যাস* প্রবন্ধে বলেন–

> ‘তাঁর মোট আঠারোটি গল্পের মধ্যে ষোলোটিই প্রেমের। সে– প্রেমকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রয়াস অবশ্যই আছে। কিন্তু দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা আর বিষয়ের বৈচিত্র্য সমার্থক নয়। এবং পাঠক দুঃখের সাথেই লক্ষ্য করেন,

> দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতায় যে সামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, একাধিক কারণে তা বিনষ্ট আর তার পটভূমিতে একঘেয়েমির সতেজ বীজ অঙ্কুরিত।'[১]

নারীকে যে নজরুল বিশেষ এক মহিমা দানের চেষ্টায় সর্বদা রত ছিলন তা নজরুলের প্রায় প্রত্যেকটি ছোটগল্পেই লক্ষ করা যায়। তাঁর মানসজাত সুধায় একেকজন নারী যেন হয়ে উঠেছেন প্রেমের আধার। প্রেমের মাহাত্ম্য সমুন্নত রাখবার জন্য নজরুলসৃষ্ট ওই নারীচরিত্রগুলো যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেছে।

ব্যথার দান গ্রন্থের *হেনা* গল্পের নায়িকা হেনা নজরুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পজুড়ে তাকে আমরা পাই প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ হিসেবে। তবে প্রথম দিকে সোহরাবের প্রেমে সাড়া দেয় নি হেনা। অন্যদিকে হেনার প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে সোহরাব কিছুটা মুষড়ে পড়ে। হয়তো প্রেমের বেদনা ভুলতেই যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় সোহরাব। যুদ্ধে যাবার কোনো কারণ আমরা সরাসরি এ গল্পে না পেলেও এটা প্রতীয়মান যে, প্রেমের কোমলতা থেকে বঞ্চিত সোহরাব রুক্ষ প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা বাজাতে চেয়েছে। নতুবা সে হয়তো বিয়েথা করে সংসারী হতো।

যা-ই হোক, ১২৭ নম্বর বেলুচ রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যায় সোহরাব। হেনা তাকে আর কিছু দিতে পারুক আর নাই বা পারুক, হেনার প্রথমবারের প্রেম-প্রত্যাখ্যানই সোহরাবের ললাটে বীরত্বের তিলকচিহ্ন এঁকে দেবার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের জন্য সোহবার অফিসার হয়। পায় 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব। পক্ষান্তরে এ যেন হেনারই দান। এটি হয়তো হেনার একটি কৌশল। প্রেমিকপ্রবরকে দিয়ে করানো একটি পরীক্ষা। অথবা একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে তার ভালোলাগার পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার গোপন প্রয়াস। কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, দ্বিতীয়বারের মতো যখন সোহরাব যুদ্ধে

যায় তখন আর কোনো ভণিতা নয়– সোহরাবের প্রেমে সাড়া দিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ হেনার। আর যুদ্ধক্ষেত্রে সোহরাবের সঙ্গিনী হয়ে, সাহচর্য দিয়ে, প্রেম দিয়ে, বল দিয়ে সাহস দিয়ে হেনা জিতিয়ে আনে সোহরাব-বাহিনীকে। বিজয়-উল্লাস করতে পারলেও প্রেমোল্লাস জোটে নি দুঃখিনী হেনার ভাগ্যে। পাঁচ-পাঁচটি গুলি বুকে নিয়ে হেনার প্রতি সোহরাবের ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্তিম শয়ানে সোহরাবের মুখে শুনি শাশ্বত ভালোবাসার নবতর অভিব্যক্তি।

> "...আমি চ'লে এলুম। হেনা ছায়ার মত আমার পিছু পিছু ছুটল! এত ভালবাসা, পাহাড়-ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মত এত প্রেম কি ক'রে বুকের পাঁজর দিয়ে আটকে রেখেছিল হেনা। ..."[২]

সোহরাবের এই অভিব্যক্তি থেকে একজন প্রেমময়ী-স্নেহময়ী নারীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়। উচ্চকিত হয় হেনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সোহরাবের বাক্যে হেনাকে আমরা আবিষ্কার করি একজন দায়িত্বশীল, ধৈর্যশীল নারী হিসেবে। সোহরাবের প্রেমে একনিষ্ঠ হয়েও, তাকে এতো কাছে পেয়েও প্রেমের সুধাপানে যে সংযমের পরিচয় হেনা দিয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে বেশ বিরলই বলা চলে।

হেনা গল্পে হেনাকে আমরা যে রূপে পাই তার তুলনায় *বাদল বরিষণের* কাজরীয়ার বেশ খানিকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত। হেনাকে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা যে মহিমা দিয়েছিল তা আমরা পাই না কাজরীয়ার মাঝে। কাজরীয়াকে দেখা যায় হীনম্মন্যতায় ভুগতে। হয়তো স্বকীয়তায় বিশ্বাসী নয় বলেই এমনটি ঘটেছে কাজরীয়ার মাঝে। 'কালো' বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না– এমন বিশ্বাসই বদ্ধমূল তার মনে। তবে তার সংশয়িত মনের সকল শঙ্কা মুছে দেয় পরদেশী প্রেমিকপ্রবর। অবশ্য অভিমানে আর বেদনায় নীল হয়ে প্রকৃতির লীন

হয় কাজরীয়া। পরদেশীর প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। তবে একদিকে পেয়ে হারানোর বেদনা আর অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রগাঢ় অভিমান কাজরীয়াকে ঠেলে দেয় না-ফেরার দেশে।

এ প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক মাসুমা খানম *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব* গ্রন্থে বলেন–

> '*বাদল বরিষণে* গল্পের কালিঞ্জরের কালোমেয়ে কাজরীয়া তার কালো চেহারা নিয়ে সংশয়িত ছিল। সকলেই তার চেহারা নিয়ে উপহাস করে। কিন্তু পরদেশীয়া যুবক যখন প্রেম নিবেদন করলো তখন সে এটাকে অপমান বলে মনে করে। এক সময় তার এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তার মনে হয় সত্যিই পরদেশী যুবক তাকে ভালোবাসে। তখন প্রেমিকের জন্য কাজরীয়া যমুনা সিনানে গিয়ে সেখানকার মাটি দিয়ে ধানের অঙ্কুর উদগম করে এবং রুগ্ন হয়ে পরদেশী যুবকের আগমনের অপেক্ষায় থাকে। তারপর যুবকের আগমন ঘটলে সে তার প্রেমিকের কানে ধানের সবুজ শিষ পরিয়ে দিয়ে সে পরদেশীর কোলে লুটিয়ে দেয় শ্রান্ত মাথা। তারপর মরণকে বরণ করে কাজরীয়া তার কালো রুপস্রষ্টার নিকট চলে যায়। পরদেশী যুবক তার প্রেমিকাকে খুঁজে পায় প্রকৃতির মধ্যে।'[৩]

নজরুলের অন্যান্য গল্পের নায়িকাদের মতোই *ঘুমের ঘোরে* প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে পরী। একজন নারী তার প্রথম প্রেমের প্রতি কতটা আপ্লুত থাকে তার অনন্য দৃষ্টান্ত পরীচরিত্র। নায়ক আজহার দেশপ্রেমে উদীপ্ত হয়ে যুদ্ধে যায়। দেশপ্রেমের কাছে নিজের প্রেম বাধা হতে পারে– এই ভেবে যুদ্ধে যাবার আগে বন্ধুকে অনুরোধ করে আজহার– যেন পরীকে ঘরণী করে। আজহারের ধারণা, পরী হয়তো যুদ্ধে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। তবে আজহার বন্ধুর কাছে পরীকে সমর্পণ করলে মন থেকে মুছতে পারে নি পরীর স্মৃতি। তেমনি অন্যের ঘরণী হয়েও মনে আজহারের জন্য প্রেমপ্রদীপ জ্বেলে রাখে পরী। এক

মুহূর্তের জন্য আজহারকে ভোলেনি সে। উবে যায় নি তার প্রেম। বাসর রাতে স্বামীর মুখে আজহারের কৌশল ও তার বিয়ের ঘটনা শুনে পরী স্বামীর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়। আজহারের প্রতি তার প্রেম যেন আরও বাড়ে। অন্যের ঘরণী হয়েও আটপৌরে বাঙালি নারীর মতো নবপরিণীত স্বামীকে কোনো ধরনের তোয়াক্কা না করে সরাসরি বলে–

> "কি ক'রে ভুলবো ? যে বিদায় নিয়ে এমন ক'রে জয়ী হ'য়ে চ'লে গেল, তাকে যে সারা জীবনেও কিছুতেই ভোলা যায় না! তিনি যদি আমার সামনে থেকে অন্য কোনো দিকে জীবনটা সার্থক ক'রে তুলতেন, তা হ'লে হয়তো তাঁকে ভুলতেও পারতাম। সব হারিয়ে যে এমন জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে এই হতভাগিনীর জন্যে, হায়! তাকে কি ভোলা যায়? নারীর ভালোবাসা কি এত ছোট?"[৪]

নজরুলের প্রায় সব গল্পের অনুষঙ্গই প্রেম। আর সেসব প্রেমে নারীদের উপস্থিতি ছিল প্রবলরূপে। নজরুলগল্পের একেকজন নারীচরিত্র প্রেমের মাঝে অমরত্ব পেয়েছে। একেকজন নারী প্রেমে মত্ত হয়েও কীভাবে কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠতে পারে তা নজরুল দেখিয়েছেন একজন দক্ষ শিল্পীর মতো। প্রায় প্রতিটি নারীচরিত্রই ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে নিয়ে গেছেন। নায়কেরা যুদ্ধে যায়। আর এর ফল ভোগ করে নারী। কেউ বন্ধুর স্ত্রী হয়ে, কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়। কেউবা আবার অন্ধ হয়ে ফিরে আসে প্রাণপ্রিয়ার কাছে। তবু শেষপর্যন্ত প্রেমে প্রোজ্জ্বল থাকে তারা। যেন কোনো স্বার্থপরতার বিষয় নেই। এ যেন পার্থিব কোনো ঘটনা নয়, স্বর্গীয় প্রেম।

ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের *অতৃপ্ত কামনা* গল্পেও আমরা যথারীতি দেখতে পাই, প্রেমের প্রতি নারীর আস্থার ভিত কতটা মজবুত। অবিচল আস্থা এখানেও নারীকে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করে। *অতৃপ্ত কামনা*র বর্ণনাকারী প্রেমের স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার প্রেমের বর্ণনা

থেকে জানা যায়, মোতি ছিল তার বাল্যবন্ধু। শৈশবে যে ছিল একেবারেই খেলার সাথী সে বড় হয়ে হয় গল্পকথকের মর্মসঙ্গী। হৃদয়মন্দিরে স্থান করে নেয় গল্পের বর্ণনাকারীর। কিন্তু নিয়তির অমোঘ খেলায় মোতি তার ভালোবাসার পাত্রকে পায়নি। মোতিকে 'সুখী' করতে পারবে না– এমন আশঙ্কায় পিছু হটে গল্পের নায়ক। বড় জমিদারের বিএ পাস ছেলের সঙ্গে মোতির বিয়ের কথা শুনে সে পিছিয়ে আসে। গল্পটির ট্রাজেডি এখানেই। মোতি প্রাণপণে চেয়েও তার প্রেমিককেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পায় না। অথচ গল্পের কথককে না পাবার কোনো কারণ ছিল না মোতির। এখানেও নারী-বঞ্চনার চিত্র ফুটে ওঠে। সমাজের ধনী-গরিব বৈষম্যের শিকার হয় মোতি। কথকের কথিত 'দারিদ্র্য' কেড়ে নেয় মোতির ভালোবাসাকে। মোতিকে সুখী দেখার জন্য কথক মিথ্যা করে বলে–

> "তোমায় এতদিন শুধু মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত করে এসেছি মোতি, কোনদিন সত্যিকার ভালোবাসি নি!"[৫]

প্রেমিকের এ কথা মোতির মর্মে যেন শেল হয়ে বিঁধে। মোতি কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না– তার প্রেমিক এতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে। প্রেমিকের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার কারণে অভিমানে কেঁদে ওঠে তার হৃদয়। প্রদীপ্ত কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করে বলে–

> "যাও, চ'লে যাও– তোমায় আমি চাই নে, স'রে যাও! তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, বে-দিল্!– যাও, স'রে যাও! তোমার পায়ে পড়ি চ'লে যাও, আর আমার ভালোবাসার অপমান ক'রো না"![৬]

তবে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, এ মোতির মনের কথা নয়। প্রেমিকের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এমন খেদোক্তি করে মোতি।

রিক্তের বেদন গ্রন্থের নামগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শহিদা। নজরুলের অন্যান্য গল্পের মতো এখানে দেখি নায়িকার বঞ্চনার চিত্র। প্রেমকে উপেক্ষা করে নায়ক হাসিন যুদ্ধে যায়। শহিদার প্রতি ভালোবাসা থাকলে হাসিনকে আমরা পুরোপুরি নিষ্ঠাবান প্রেমিকের মর্যাদা দিতে পারি না। যুদ্ধরত হাসিনকে ভালোবেসে ফেলে প্রতিপক্ষের এক বেদুঈন যুবতী– গুল। এই অযাচিত ভালোবাসার প্রতি সমর্থন ছিল হাসিনের। যদিও সে জানতো তার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে শহিদা। অবশ্য শহিদা জানার আগেই পরপারে চলে যায় গুল। একদিন কুতল্-আমারার অধিনায়ক হাসিনের সহযোগীর কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিতে আসে গুল। তখন হাসিনের গুলিতে প্রাণ হারায় সে। গুলিবিদ্ধ গুল এসময় হাসিনের কোলে মাথা রেখে বলে–

‘এই “আশেকের” হাতে “মাশুকের” মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন?’[৭]

রিক্তের বেদন-এর *মেহের নেগার* গল্পের নায়িকা গুলশান। গল্পের নায়ক সুদর্শন য়ুসোফ স্বপ্নে দেখে তার কল্পনার নায়িকা মেহের নেগারকে। কিন্তু একদিন গুলশানকে দেখে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পায় য়ুসোফ। প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে যায় গুলশানের। গুলশান ছিল পাঞ্জাবের বিখ্যাত বাইজি খুরশেদ জাহানের মেয়ে। বাইজির মেয়ে পরিচয় পেয়েও গুলশানের প্রতি য়ুসোফের প্রেমের ঘাটতি হয় না। ভালোবাসার গভীর জলে সাঁতার কাটতে থাকে তারা। আর তাদের সেই ভালোবাসা ছিল সরোবরের জলের মতোই স্বচ্ছ আর পূত-পবিত্র।

তবে বাস্তবের যাঁতাকলে অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও বিচ্ছেদ ঘটে নায়ক-নায়িকার। বাস্তবতা হুঙ্কার দিয়ে সামনে এসে হাজির হয় খলনায়কের মতো। নারী হিসেবে নিজেকে

'অভাগিনী' মনে করে গুলশান। বাইজির মেয়ে হওয়ায় নিজেকে অপবিত্র অচ্ছ্যুৎ ভেবে দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। শুরু হয় বিরহ-যাতনা। বিরহের এই অনলে য়ুসোফ না যতটা পুড়েছে তার চেয়েও লাখো-কোটি গুণ দগ্ধ হয়েছে গুলশান। তার উক্তির মাধ্যমে গুলশান-চরিত্রে বিরহ-ব্যথার চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেন নজরুল।

য়ুসোফকে উদ্দেশ্য করে গুলশান বলে–

> "...আমার– আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ুসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর ক'রে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালোবাসি তার'ই অপমান ত করতে পারি নে আমি! এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পার্‌ব। অভাগিনী নারী জাতি আমাদের এর চেয়েও যে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।"[৮]

গল্পের ঘটনার পরিক্রমায় যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় য়ুসোফ। আর ভাবে, যুদ্ধে যাবার আগে শেষবারের মতো গুলশানের সঙ্গে দেখা করা সমীচীন। গুলশানদের বাড়িতে গিয়ে সে একটি কবর দেখতে পায়। জনমানবশূন্য ওই বাড়িতে কবরের গায়ে প্রস্তরফলকে লেখা–

> "অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক , আমায় ঘৃণা করো না! একবিন্দু অশ্রু ফেলো, আমার কল্যাণ কামনা ক'রে– আমি অপবিত্র কি-না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল! ... তবে আমায় মনে ক'রে কেঁদো না। যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই।"[৯]

শিউলিমালা গ্রন্থে জিনের বাদশা গল্পের মূল উপজীব্য চান ভানু ও আল্লারাখার প্রণয়। নারীর জন্য পুরুষের সহানুভূতি ও আত্মনিবেদনের চিত্র উঠে এসেছে গল্পটিতে। চান ভানুকে পাওয়ার জন্য আল্লারাখা একের পর এক কাণ্ড ঘটায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার সব

চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। পাশের গ্রামের ছেরাজ হাল্‌দারের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় চান ভানুর। নজরুলের অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পের নায়কও বিচ্ছেদের আনন্দে যেন অত্যুজ্জ্বল ও মহীয়ান।

গ্রন্থটির নামগল্প *শিউলিমালা* নিটোল প্রেমের গল্প। তবে এ গল্পের পটভূমি অন্যান্য গল্পের মত গ্রাম নয়, শহর। সেই সঙ্গে গল্পটির চরিত্রগুলোও শিক্ষিত, মার্জিত ও পরিশীলিত। গল্পের নায়িকা শিউলির রয়েছে দাবাখেলায় বিশেষ হাত। দাবাখেলায় দক্ষ শিউলির সঙ্গে খেলে নায়ক আজহারের মন্তব্য–

> "দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ন মিস মেন্‌চিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশি বেগ পেতে হয় নি আমাকে আমি ত প্রায় হেরেই গেছিলাম।"[১০]

কেবল দাবাখেলায়ই নয়, সংগীতেও ছিল শিউলির বিশেষ পারঙ্গমতা। অত্যন্ত দরদ দিয়ে গাওয়ার ফলে গানের একেকটি কলি যেন হয়ে ওঠে শিউলিরই প্রাণের আর্তি, আত্মনিবেদন। শিউলির হৃদয়স্পর্শী গানের শ্রোতারা সহজেই যেন তার কণ্ঠের প্রেমে পড়তে বাধ্য হতেন। তার কণ্ঠের মাধুর্য কর্ণকুহরে পৌঁছুবার আগেই যেন শ্রোতা-হৃদয়ের গভীরে বিশেষ এক অনুরণন সৃষ্টি করত, ঢেউ তুলত, তৃপ্তির অবগাহনে ভাসিতে দিত শ্রোতার হৃদয়কে। এর প্রমাণ আজহার।

শিউলির গান শুনে মুগ্ধ আজহারের অনুভূতি–

> 'এ সেই কণ্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বল্‌তে গেলাম, "অপূর্ব!"'[১১]

নজরুলের অন্যান্য গল্পের মত এখানেও সরলীকরণ করা যায়, শ্রেণি ভাগ করলে সহজেই বলা যায়, *শিউলিমালা*ও বিচ্ছেদের গল্প। তবে আর সব গল্পের নায়িকার মত নয় শিউলি। ‘কালচার্ড’ বলতে আমরা যাকে বুঝি, শিউলি যেন তাদেরই প্রতিভূ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যেখানে পর্দাপ্রথা মুসলিম সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল সেখানে একটি আধুনিক সমাজের প্রতিকৃতি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন নজরুল। শিউলি চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো বা নতুন কোনো সমাজ কিংবা ভারসাম্যপূর্ণ নারী-পুরুষ সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের চেষ্টা করেছেন। কারণ আমরা দেখি, শিউলি গান গায়, দাবা খেলে, যাকে বলে বাইরের মানুষ, সেসব পুরুষের সঙ্গেও অবলীলায় মিশতে দেখি তাকে। তৎকালীন সমাজে নিঃসঙ্কোচচিত্তে পুরুষের সঙ্গে বসে দাবাখেলা কিংবা ‘পরপুরুষে’র সামনে গলা ছেড়ে গান গাওয়া– শিউলি চরিত্রকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। তাই বলে তাকে লজ্জাহীনা হতে দেখি না কখনোই। ব্যক্তিত্বের এতটুকু বিসর্জন কখনও শিউলিকে দিতে দেখা যায় না।
নূরহাজান। অনিন্দ্য সুন্দরী, সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ। নূরজাহানদের বাড়িতে জায়গীরদার আসে গ্রামের সহজ-সরল সবুর। মাথা নিচু করে চলা, সারাক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা সবুর যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে পারে না। তার এ সারল্য দোলা দিয়ে যায় *অগ্নিগিরি*র নূরজাহানের মনে। এটি একটি নিখাদ প্রেমের গল্প। *শিউলিমালা* গল্পগ্রন্থের ৪টি গল্পের মধ্যে সবচেয়ে সুখপাঠ্য গল্প এটি। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত ময়মনসিংহ অঞ্চলের কথ্যভাষার ব্যবহার দেখতে পাই এ গল্পে। এটি এই গল্পকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

সবুরের কাছে উর্দু ভাষা শিখতো নূরজাহান। মেধাবী নূরজাহানের যতটা না লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ ছিল তার চেয়ে বেশি মনোযোগ ছিল শিক্ষকের যত্নআত্তির প্রতি। নূরজাহান চরিত্রের মধ্যে বাঙালি নারীর চিরায়ত কোমল আর স্নেহশীল রূপ অঙ্কিত

হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা সহজ-সরল সবুরকে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে জ্বালাতন করতো। চুল কাটাতে গেলে নাপিতকে ইশারা দিয়ে টিকি রাখানোসহ হেন কোনো অপকর্ম নেই যা পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা করে নি।

তবে এতে সবুর যতটা না বিরক্ত তারচেয়েও বেশি বিরক্ত ছিল নূরজাহান। নূরজাহান তাকে রীতিমতো ভৎর্সনা করে। সবুরের পৌরুষ নিয়েও কটূক্তি করতে থামে না নূরজাহান। এসবই আসলে ছিল ভালোবাসার মানুষের জন্য দরদের প্রমাণ। একদিন হাতি দেখাকে কেন্দ্র করে ছেলেরা সবুরকে উত্যক্ত করলে নূরজাহান এর প্রতিশোধ নিতে বলে। নূরজাহানের তিরস্কারে ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে সবুরের। সবুর সবাইকে তাড়া করে পুকুরে ফেলে দেয়। এ সময় আমির নামের এক যুবক দুফলা ছুরি নিয়ে তাকে আক্রমণ করে। সবুর সেই ছুরি কেড়ে নিতে গেলে আমির পড়ে গিয়ে ছুরি তার নিজের বুকেই বিদ্ধ হয়। পরে আমিরের মৃত্যু ঘটে। সাত বছরের জেল হয় সবুরের। সবুরের প্রতি নূরজাহানের আগে যে দরদ ছিল তা রূপ নেয় গভীর অনুরাগে। এখানে বিচ্ছেদ প্রেমকে দেয় গভীরতা। সেই সঙ্গে ছিল অনুতাপবোধও। কারণ নূরজাহানের অপমানই সবুরকে প্রতিবাদী করেছিল। সপরিবারে মক্কা যাওয়ার আগে বাবা-মার সঙ্গে নূরজাহানও সবুরের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এ সময় তাদের কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরস্পরকে তারা কতটা ভালোবাসতো।

কারাগারে দেখা করতে গেলে জামার হাতায় চোখ মুছে সবুর নূরজাহানের উদ্দেশে বলে ওঠে–

> " আল্লায় যদি এই দুনিয়ায় দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্জ্যা লইবাম।"[১২]

এ সময় সবুরের পায়ের ধুলা নিতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নূরজাহানও বলে–

> "তাই দোওয়া কর।"[১৩]

গল্পের শেষপ্রান্তে এসে গল্পকার বলেন–

> 'কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল– সেই দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের মনে হল– তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল!'[১৪]

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মূল্যায়ন করতে গিয়ে নজরুল-গবেষক মাসুমা খানম তার *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব* গ্রন্থে বলেন–

> 'এ গল্পে প্রেমের জন্য পুরুষের দুঃসাধ্যসাধন এবং নারীর একনিষ্ঠ প্রেমানুভূতির চিত্র প্রকটিত হয়েছে।'[১৫]

নজরুলরচিত নারী চরিত্রগুলো সমহিমায় ভাস্বর। বস্তুত তিনি গল্পগুলোর কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি একেকজন নারীকে সহানুভূতিশীল আর প্রেমের জন্য আত্মনিবেদনকারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। ভালোবাসার মানুষটির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করার প্রবণতা ছিল প্রায় সব নারীচরিত্রের মধ্যেই। তাঁর গল্পের নারীরা পুরুষশাসিত সমাজে অবস্থান করেও স্বকীয়তায় বিশ্বাসী। পুরুষের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা নয়, বরং প্রেমিক-পুরুষের কল্যাণের জন্যই সবসময় উৎকণ্ঠিত থাকতে দেখি তাদের।

অবশ্য নজরুল তাঁর সমকালীন সমাজকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন, সেসময় নারীকে কীভাবে বিয়ের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। বাল্যবিবাহ তৎকালে কীভাবে জেঁকে বসেছিল তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন নজরুল।

রিক্তের বেদন-এর *বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী*তে কিশোরী রাবেয়া কনে হতে বাধ্য হয় মাত্র ১২ কি ১৩ বছর বয়সে। আর রাবেয়ার 'স্বামী' তখন মাত্র থার্ড ক্লাসের ছাত্র! বাবা-মায়ের ইচ্ছেয় বিয়ে করলেও 'সংসারী' হওয়ার ধারে-কাছেও ছিল না নায়ক। পরীক্ষা দেয়ার জন্য কলেজে গেলে রাবেয়া রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। গল্পটিতে আমরা অমানবিক সমাজের এক নিদারুণ চিত্র পাই। রাবেয়ার মৃত্যুতে গল্পের কথক ছাত্রের শোক কাটতে না কাটতেই তার বাবা-মা আবারও বিয়ের উদ্যোগ নেয়। রাবেয়ার পর এবার তাদের মনে ধরে 'সখিনা'কে। রাবেয়ার মতোই কমবয়সী সখিনার সঙ্গে বিয়ে হয় গল্পের বর্ণনাকারী ছাত্রের। তবে নায়কের মন পড়ে থাকলো পরপারের রাবেয়ার প্রতি। প্রথম স্ত্রীর ভালোবাসা কিছুতেই, কোনকিছুতেই ভুলতে পারেনি নায়ক। দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি কোন অনুরাগ জন্মালো না তার। এতে করে অভিমান জন্মে সখিনার মনে। ভালোবাসাহীন জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে তার কাছে। সেও রাবেয়ার মতোই পাড়ি দেয় পরপারে। নারীর প্রতি পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে অভিভাবক হিসেবে শ্বশুর-শাশুড়ির নিগ্রহের চিত্রে ফুটে ওঠে গল্পটিতে।

বাঙালি সমাজে নারীজাতি কতটা উপেক্ষিত, নিগৃহীত, নির্যাতিত তার করুণ সাক্ষী নজরুলের ছোটগল্প। তাঁর অনেক গল্পেই আমরা দেখি, নারীদের কতটা অবহেলা সইতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মুখ ফুটে কথা বলবার সুযোগটুকুও ছিল না নজরুলের ছোটগল্পে নারীচরিত্রগুলোর। নারীদের অলক্ষুণে আর নেতিবাচক হিসেবে দেখা হতো। তিরস্কার করা

হতো 'অপয়া' হিসেবে। এ চিত্র আমরা পাই বেশকিছু গল্পে। কলেরায় স্বামী-শাশুড়ি মারা গেলেও পাড়া-প্রতিবেশী 'অপয়া' হিসেবে গৃহবধূর ওপর দোষ চাপায়।

রিক্তের বেদন-এর *স্বামীহারা* গল্পের নায়িকা বেগম সমাজের চরম নিগ্রহের শিকার। বিধবা হওয়ার পর তার ওপর যেন নেমে আসে খড়্গ। নিয়তির করাল গ্রাসে ছেলেবেলায়ই দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হয় বেগমকে। দরিদ্র বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর বেগমের দায়িত্ব নেয় তার মায়ের এক বান্ধবী (সইমা)। সেই সইমা নিজের বিএ পাস ছেলে আজিজের সঙ্গে বেগমের বিয়ে দেয়। বিয়ের পর শাশুড়ি ও স্বামীর আদরে বেগমের জীবন বেশ সুখেরই হয়েছিল। তবে আজিজের আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। অনেকেই বেগমের দারিদ্র্যকে উপহাস করতে লাগল। কেউ কেউ কথা বললো বংশমর্যাদা নিয়েও। 'ছোটবংশে'র মেয়ে বলে আজিজের মতো 'শিক্ষিত' ছেলের সঙ্গে বেগমের বিয়েভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলো। কোনো কোনো পড়শি বলতো–

> 'বুনিয়াদী খান্দানে এমন একটা খট্‌কা, এও কি কখন সয়? এত বাড়াবাড়ি সইবে না, সইবে না।'[১৬]

প্রিয়তম স্বামীর শোকে বিহ্বল বেগম। কিন্তু তাই বলে তাকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় আত্নীয়-স্বজন আর পাড়ার লোকজন। আজিজের লাশ কাঁধে করে বাইরে আনার পর এক আত্নীয় বেগমের চুল ধরে বলে–

> 'যা শয়তানী, বেরো ঘর থেকে এখনি! তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদী খান্দানের উপর নাক চড়ান, এ সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত

> রইলো না কেউ; বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস্ না। আর ইচ্ছা হয় চল্, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি![১৭]

স্বামীকে হারিয়ে দুঃখ নেই বেগমের। নিয়তিকে সে জানে ভালোভাবেই। তাই সবসময় মেনে নেয়। ছোটবেলায় পরিবারের সবাইকে হারিয়ে যখন অবলম্বন হলো আজিজ আর তা মা তাও বছর দুয়েকের মাথায় বিয়োগ হলো। তবে এখানে আজিজের প্রতি বেগমের অটুট ভালোবাসার প্রমাণ আমরা পাই মুখরা আত্মীয়ের উক্তির পর। কারণ বেগম দ্বিতীয় বিয়ের কথা কল্পনাই করতে পারে না। বেগম বলে–

> '–অত মার গাল কিছুই বাজে নাই আমার কানে, যত বেজেছিল ঐ একটা নেকার কথাই। ঐ বিশ্রী কথাটা একটা মস্ত আঘাতের মত বেজেছিল আমার চূর্ণ বক্ষে।'[১৮]

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী কোনকিছু না ভেবে স্বামীর মৃত্যুর জন্য বেগমকে দায়ী করে। *স্বামীহারা* গল্পে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক বিধবা রমণীর জবানীতে লেখক আসলে তখনকার সমাজের শত শত বিধবার করুণ আর্তি তুলে এনেছেন।

নজরুলের গল্পে আমরা যেমন নারীকে দেখি অবহেলিত ঠিক তেমনি দেখি অবহেলার শিকার হয়ে ফুঁসে উঠতে। পুরুষের হঠকারিতার প্রতিশোধ নিতে খুন করতেও দ্বিধা হয় না তাদের। তেমনি এক চরিত্র *রাক্ষুসী* গল্পের বিন্দি। স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার ছিল বিন্দির। তিল তিল করে রাতদিন পরিশ্রমের মাধ্যমে সংসারটি গড়ে তোলে সে। নিজে না খেয়ে স্বামী-সন্তানকে খাইয়েছে, পরিয়েছে। কিন্তু তাতে উড়ে এসে জুড়ে বসে রঘো বাগদীর মেয়ে। স্বামীকে পরনারী থেকে ফেরাতে বিন্দির হাজার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর একসময় দা হাতে উঠে আসে বিন্দির। প্রেমময়ী বিন্দি হয়ে ওঠে স্বামীহন্তারক। ফল

হিসেবে ভোগ করে সাত বছরের কারাদণ্ড। তবে দৃশ্যমান এই দণ্ডের পরও সমাজের অদৃশ্য দণ্ড থেকে মুক্তি মেলে না বিন্দির। নিয়তির করাল ছোবলে সে সমাজ পরিত্যক্তা হয়। মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না। ছেলেকেও নিষ্ঠুর সমাজ করে রাখে একঘরে। শুধু মেয়ে বলেই সমাজ তাকে এমন আমানবিক শাস্তি দিয়েছে, বানিয়েছে 'রাক্ষুসী'। তৎকালীন সমাজের ধ্বজাধারী কতিপয় মানুষের নির্মম আচরণের প্রতিচ্ছবিই যেন এ গল্প। মেয়েদের প্রতি যে অন্যায্য আচরণ করা হতো তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাই এ গল্পের পরতে পরতে।

নজরুলের গল্পগুলোতে নারীচরিত্রে নানাপ্রকারে বিরহ এসেছে। এসেছে যন্ত্রণাকাতর জীবনের প্রতিচ্ছবি। গল্পগুলোতে যেমন কোমল নারীমূর্তি আমরা আবিষ্কার করি ঠিক তেমনি প্রতিবাদী হিসেবেও দেখি কোথাও কোথাও। গল্পগুলোতে নারীর মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে সুচারুরূপে। এ প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর *নজরুল-চরিতমানস* গ্রন্থে বলেন–

> "'রাক্ষুসী' ও 'স্বামীহারা' গল্প দুটিতে দুটি নারীর যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে। উভয় গল্পেই নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নজরুলের জ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে তাঁর সচেতনা অসতর্ক পাঠকের মনকেও আকর্ষণ না করে পারে না।"[১৯]

নজরুলের ছোটগল্পে একেকজন নারী কেবল প্রেমময়ী কিংবা প্রণয়িনীই নয় স্নেহময়ী মাও বটে। বিশেষ খোদাভক্তিও ছিল তাদের মধ্যে। তাঁর একাধিক গল্পে এর প্রমাণ মেলে। *রিক্তের বেদন*-এর *স্বামীহারা* গল্পের আজিজের মা চরিত্রটি নজরুলের এক মহৎ সৃষ্টি। তার সন্তানবাৎসল্য আমাদের মুগ্ধ করে। সবচেয়ে বড় যে বিষয়, তিনি শুধু তার ছেলেকেই ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন অন্যের সন্তানকেও। তাই নিজের সই মারা যাওয়ার পর অনাথা বেগমকে নিজের বিএ পাস ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন। সমাজের জাতপাত প্রথাকে

বুড়ো আঙুল দেখান তিনি। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের কটূকথার মুখে ছাই দিয়ে ঘরে তোলেন বেগমকে। নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করতেন বেগমকে। ব্যক্তিত্বে আর স্বাতন্ত্র্য ছিল আজিজের মায়ের চরিত্রের অন্যতম দিক। কেউ কেউ তার পুত্রবধূর জাত নিয়ে প্রশ্ন তুললে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন–

> "জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিফের মত সেই ত' আশরাফ। খোদা কিয়ামতের দিনে কখ্খনো এমন বলবেন না যে, তুমি সৈয়দ সাহেব, তোমার আবার পাপ পুণ্যি কি, তোমার নিঘ্ঘাত বেহেশ্ত আর তুমি 'হালগজ্জা' শেখ, অতএব তোমার সব 'সওয়াব' (পুণ্য) বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার কপালে ত' জাহান্নাম ধরাবাধা! আমি চাই শুধু গুণ, তা সে যে জাতই হোক না কেন।"[২০]

সন্তানবাৎসল্যের দিক থেকে নজরুলগল্পের অন্যান্য নারীচরিত্রে সাযুজ্য বিদ্যমান। *শিউলিমালা* গ্রন্থের *পদ্ম-গোখ্‌রো* গল্পের জোহরা এবং *অগ্নিগিরি* গল্পের নূরজাহানের মা সন্তানবৎসল জননী হিসেবে চিত্রায়িত। *পদ্ম-গোখ্‌রো* গল্পে নজরুল অদ্ভুত এক মাতৃত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন। মীরবাড়ির বৌ জোহরা বাড়িতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। তার চিররুগ্‌ণ শাশুড়ি হঠাৎ করেই যেন সুস্থ হয়ে যায়। পুরনো বাড়ির দেয়ালে তারা গুপ্তধন আবিষ্কার করে। এবং গুপ্তধনের সঙ্গে আবিষ্কার করে দুটো পদ্মগোখরো। বাস্তুসাপ মারতে নেই– জোহরার শ্বশুরপক্ষের লোকজনের এমন ধারণার ফলে সাপ দুটি নিরপদে স্থানত্যাগের সুযোগ পায়। জোহরার স্বামী আরিফের ব্যবসায় দিনকে দিন উন্নতি ঘটে। গল্পের এ পর্যায়ে একটা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত। জোহরা সাপ দুটির প্রতি অত্যধিক স্নেহ প্রদর্শন শুরু করে। মাতৃস্নেহের কাছে বিষধর সাপও একসময় বশ মানে। সারাক্ষণ জোহরার পিছু পিছু ঘোরে তারা। এমনকী শয্যাতেও সাপ

দুটি জোহরার বুকে আশ্রয় খোঁজে। বিয়ের প্রথম বছরই জোহরার জমজ সন্তান জন্মলাভ করে। জন্মের পরপরই মারা যায় তারা। জমজ সন্তানের এমন অকালমৃত্যুতে শোকাহত জোহরা মনে করে, সাপ দুটি তার সন্তানের রূপ ধরে ফিরে এসেছে। জোহরার বাড়াবাড়ি দেখে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের প্রায় সবাই বিরক্ত। সাপের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য জোহরাকে তারা পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেয়। পিত্রালয়ে গিয়ে জোহরা তার পিতা-মাতার ভয়ঙ্কর আর লোভী রূপ প্রত্যক্ষ করে। সে রূপ এতটাই ভয়ঙ্কর যে তারা মেয়ের জামাইকে প্রাণে মারার জন্য নানা কূটকৌশল অবলম্বন করতে কার্পণ্য করে না। অবশ্য শেষপর্যন্ত কোনরকমে বেঁচে ফিরে আসে জোহরা ও তার স্বামী আরিফ। এরপর আবার স্বাভাবিক ঘর-সংসার শুরুর পর সাপ দুটিও জোহরার কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে থাকে। এরই মাঝে জোহরার মা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অনুতপ্ত পিতা মক্কা যাওয়ার আগে মেয়েকে শেষবার দেখতে গোপনে আরিফদের বাড়িতে আসে। কিন্তু পদ্মগোখরোর বিষাক্ত ছোবল থেকে শেষরক্ষা হয় নি জোহরার বাবার। আত্মরক্ষার জন্য তিনিও লাঠির আঘাতে সাপ দুটিকে হত্যা করে। সাপের কামড়ে বাবার প্রয়াণ এবং সন্তানতুল্য সাপ দুটির মৃত্যুতে জোহরার বুকে যেন বজ্রপাত ঘটে। বাবা এবং সাপ দুটির মৃত্যু হয়েছে– স্বামী আরিফের কাছ থেকে এমনটা শুনে মূর্ছা যায় জোহরা।

অপত্য মাতৃস্নেহের কাছে নাগজোড়ের এভাবে বশ মানার ঘটনা বাংলাসাহিত্যে অভিনব এক সংযোজন। অকৃত্রিম স্নেহের সুধায় সিক্ত হয় সাপ দুটি। বিষধর হয়েও স্নেহধারায় সিক্ত হয়ে কখনও কোনো মানুষের ক্ষতি করে নি সাপ দুটি। এ গল্পে একদিকে জোহরার অন্ধ মাতৃত্বের বশে স্নেহের ছায়ায় সাপকে আবদ্ধ করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে অর্থলোভে তারই বাবা-মা সাপের হিংস্রতার চেয়েও পাশবিক যে আচরণ করেছে তা নজরুল একজন দক্ষ শিল্পীর মতোই তুলির নিপুণ আঁচড়ে অঙ্কন করেছেন।

অগ্নি-গিরি গল্পের নায়ক সবুরকে নূরজাহানের মা নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। সবুরের খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সার্বিক যত্নআত্তির কোনো অবহেলা নূরজাহানের মায়ের জ্ঞাতসারে কখনও হয় নি। নিজের ছেলে না থাকায় সবুর খুব সহজেই সেই স্থানটি দখল করে নেয়। সবুরের গুণের রীতিমতো ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন নূরজাহানের মা। সবুরের প্রতি তার কতটা ভালোবাসা ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই– ঘটনা পরিক্রমায় সবুরের যখন জেলে যাবার উপক্রম হয়। এসময় তিনি বলেন–

> ‘আমার পোলা এ, আমি দশ হাজার ট্যাহা দিবাম, দারোগাব্যাডারে কন, হে এরে ছ্যাইরা দিয়া যাক্।’[২১]

কেবল নূরজাহানের মায়ের একতরফা ভালোবাসাই নয়, মাতৃস্নেহের কাছে হার মেনেছে সবুরও। সে নিজেও নূরজাহানের মাকে নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো। নূরজাহানের মায়ের স্নেহ পেয়ে সে তার মায়ের শোকও কাটিয়ে উঠেছিলো। গল্পে আমরা সবুরের মুখে শুনতে পাই–

> ‘আম্মাগো এই তিনডা বছরে আপনি আমায় আমার মায়ের শোক ভুলাইছিলেন।’[২২]

*অগ্নি-গিরি*তে কেবল নূরজাহানের মা আর সবুরের কথোপকথনই নয়, সবুরের প্রতি নূরজাহানের মায়ের অশেষ স্নেহের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

> 'নূরজাহানের মা সবুরকে তার গুণের জন্য ছেলের মতই মনে করতেন। তা ছাড়া, তাঁর পুত্র না হওয়ায় পুত্রের প্রতি সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ গোপনে সবুরকে ঢেলে দিয়েছিলেন।'[২৩]

জিনের বাদশা গল্পের চান ভানুর মাও সন্তানবাৎসল্যের মহিমায় চিত্রিত হয়েছে। চান ভানুর বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবার উপক্রম হলেও মাতৃস্নেহের কারণে তা যেন ধরা পড়ে না। মা যখন বুঝতে পারে তার মেয়ের জন্যই আল্লারাখার এত কাণ্ডকীর্তি। সেই সঙ্গে আল্লারাখাই চান ভানুর স্বাস্থ্যহানির কারণ। তখন অসহায়ত্বে তাকে নীরবে-নিভৃতে চোখের পানি ফেলতে হয়েছে।

নারীর 'মন' প্রসঙ্গে নজরুলের গল্পের নায়কদের মধ্যে প্রায় একই ধরনের মনোভঙ্গি লক্ষণীয়। *রাজবন্দীর চিঠি*তে নারী সম্পর্কে নায়কের ধারণা হচ্ছে–

> 'পুরুষ জন্ম-জন্ম সাধনা করেও নারীর মন পাচ্ছে না। নারীর অন্তরের রহস্য বড় জটিল, বড় গোপন। নারী সব দিতে পারে, কিন্তু তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্জিকাটি যেন কিছুতেই দিতে চায় না।'[২৪]

একই গল্পে নারীদের প্রতি নায়কের অভিমানের চিত্রও ফুটে ওঠে এভাবে–

> "তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব বেশি শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হ'তে তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন র'য়ে গেল যে, তারা পুরুষের ভালবাসার বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা অপমান করে! তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী ক'রতে পারে না।"[২৫]

নজরুলের অন্যান্য গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যেও নারী সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল প্রকটিত। নারীর মনকে বুঝতে না পারার ব্যাকুলতা থেকে নায়কেরা বিভিন্ন উক্তি করেছে।

ব্যথার দান গ্রন্থের *হেনা* গল্পের নায়ক সোহরাবের কথায় নারী জাতির প্রতি তার মূল্যায়ন অনেকটাই কষ্টজাত। হেনার দেওয়া মনোকষ্টে পুরো নারী জাতিকে নিয়ে কথা বলতেও পিছপা হয় নি সোহরাব। বলে ওঠে–

> ‘দুনিয়ার সব চেয়ে মস্ত হেঁয়ালি হ’চ্ছে মেয়েদের মন!’[২৬]

ঘুমের ঘোরে গল্পে আজ্‌হার দূর-সম্পর্কের এক বোনের বিষয়ে নিজের দ্বিধা প্রকাশ করতে ছাড়ে নি। অন্যান্য গল্পের মতো এ ক্ষেত্রেও পুরো নারীজাতিকে নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ পায় গল্পটির নায়ক আজ্‌হারের মুখে–

> ‘হায় রে সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনিগণ! তোরা চিরকালই এমন সন্ন্যাসিনী, অথচ ভারে ভারে পবিত্র স্নেহ ঘরে ঘরে বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস! বড় দুঃখ, তোদের সহজে কেউ চেনে না।’[২৭]

তথ্যনির্দেশ

১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *নজরুল ইসলাম*, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা–৩০৩

২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৬২৪

৩. মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৬৬

৪. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৬৪৩

৫. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৪৯

৬. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৪৯

৭. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৭৩

৮. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৮৯

৯. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৯০

১০. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭৬২

১১. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৬৩

১২. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৫৭

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৫৭

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৫৭

১৫. মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৬৮

১৬. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭১১

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা–৭১৫

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা–৭১৫

১৯. ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস*, প্রথম প্রকাশ ৩০শে মে,১৯৬০, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা , পৃষ্ঠা–২৭৮

২০. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭১৩

২১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭৫৫

২২. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৫৫

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৫৫

২৪. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৬৫৫

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৫৯

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা–৬২৩

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের উপন্যাসে নারীচরিত্র

বাংলা কথাসাহিত্যকে কাজী নজরুল ইসলাম নতুন একটি রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাসেই আমরা পাই নতুনত্বের স্বাদ। একজন ছোটগল্পকার হিসেবে নজরুল যতটা না সফল তার চেয়ে বেশি সফল ঔপন্যাসিক হিসেবে। মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করেই যে একজন সফল আর জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে সাহিত্যজগতে স্থান করে নেওয়া যায় নজরুল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুহম্মদ আবদুল হাই *ঔপন্যাসিক নজরুল* প্রবন্ধে বলেন–

> ‘একটা যুগের স্রষ্টা হিসেবেই নজরুল বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় একটা ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছেন। নজরুল প্রতিভার ছোঁয়া সাহিত্যের যে ধারায় লেগেছে তাতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কম হয়নি। উপন্যাস রচনাতেও তাই দেখা যায় তিনি গতানুগতিকতার পথে পা বাড়াননি।’[১]

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হন *বাঁধন-হারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), এবং *কুহেলিকা* (১৯৩১) উপন্যাস নিয়ে। নজরুল যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সর্বব্যাপী প্রভাবের দিনেও সম্পূর্ন নতুন রীতিতে নতুন ভাষায়, ভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস রচনার মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নজরুল। নজরুলের প্রথম জীবনের গদ্য-রচনা পড়ে আবুল ফজল মন্তব্য করেন–

> ‘সবই নূতন, ভাষা নূতন, প্রকাশভঙ্গি নূতন, বিষয়বস্তু নূতন। এর আগে মুসলমান লেখকদের দেদার লেখা আমি পড়েছি, মুসলমানী বাংলা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গেও আমি অপরিচিত ছিলাম না। কিন্তু এমন করে সমস্ত সত্তার শিকড়শুদ্ধ নাড়া দিতে কেউ পারে নি এর আগে।’ [২]

একজন দক্ষ কারিগরের মতোই উপন্যাসগুলোকে তিনি পৃথক শ্রেণিভুক্ত করেছেন। একটিতে উঠে এসেছে ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি, অন্যটিতে সমাজ, বাকিটিতে রাজনীতি। উপন্যাসগুলোকে এভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়– *বাঁধন-হারা* : পত্রোপন্যাস, *মৃত্যুক্ষুধা* : সামাজিক উপন্যাস এবং *কুহেলিকা* : রাজনৈতিক উপন্যাস।

নজরুলের প্রথম উপন্যাস *বাঁধন-হারা*। উপন্যাসটি ১৩২৭ সালের *মোসলেম ভারত*-এ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ রচনাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। তবে এর আগে আমরা নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বসন্তকুমারের পত্র* (১৮৮২) এবং অম্বিকাচরণ গুপ্তের *পুরানো কাগজ ও নথির নকল* (১৮৯৯) নামে দুটি পত্রোপন্যাস পাই। কিন্তু সেগুলো নজরুলের রচনার তুলনায় নিতান্ত অপরিণত চিন্তার ফসল বলেই মনে করেন সমালোচকরা। এছাড়াও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ*তে পত্রের ব্যবহার দেখতে পাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে চারটি মুসলমান পরিবারকে কেন্দ্র করে *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে ওঠে। উপন্যাসটির নায়ক নূরুল হুদা করাচির সেনানিবাসে এক শিক্ষার্থী-সৈনিক। সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সেখান থেকে সে চিঠি লিখেছে বন্ধু রবিয়ল ও মনুয়রকে, রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া এবং শেষে সাহসিকাদিকে। নূরুল হুদা রবিয়লের বন্ধু। রবিয়লের মা রকিয়া, স্ত্রী রাবেয়া, বোন সোফিয়ার সাথে তার একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রবিয়লের মা নূরুল হুদাকে আপন সন্তানের মতোই স্নেহ করেন। রবিয়লের নিকটাত্মীয় আয়েশা ও তার মেয়ে মাহ্বুবা রবিয়লদের সঙ্গে বসবাস করে।

নূরুল হুদার সঙ্গে মাহ্বুবার বিয়ের সবকিছু ঠিকঠাক হলে হঠাৎ করে কাউকে কিছু না বলে সে যুদ্ধে চলে যায়। এতে মাহ্বুবা ও তার মা প্রচণ্ড অপমানিত ও মর্মাহত হয়। এবং

Dhaka University Institutional Repository

আয়েশা তার মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যায়। সেখানে বীরভূমের এক বৃদ্ধ জমিদারের সাথে মাহ্‌বুবার বিয়ে হয়। কিন্তু সন্তান হওয়ার আগেই বিধবা হয় সে। সোফিয়ার সাথে মনুয়রের বিয়ে হয়। নূরুলের এক চিঠি থেকে জানা যায়, সোফিয়া খুব অসুস্থ। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। মাহবুবা তীর্থস্থান পরিদর্শনে বের হয়। এ ঘটনাগুলোই মোট আঠারোটি পত্রের মাধ্যমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *বাঁধন-হারা* আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিনব। সমগ্র উপন্যাসটি পত্রালাপের বিন্যাসে রচিত। প্রধানত মুসলমান পরিবারের চিত্রই আমরা এ উপন্যাসে পাই। পরিবারগুলি খুব ধনী নয় আবার দারিদ্র্যপীড়িতও নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং সেই সময়ের হিসেবে যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত তারা। পরিবারের ছেলেগুলি যেমন কলেজে পড়েছে তেমনি মেয়েরাও স্কুল-কলেজে পড়েছে। সাধারণ পর্দা রাখলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে অবরোধের বাড়াবাড়ি নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুরে বাংলা লেখাপড়ার প্রচলন যে শুরু হয়ে গেছে তা আমরা সবার চিঠি লেখার ধরণ দেখেই বুঝতে পারি। বাড়ির প্রবীণা জননী থেকে কিশোরী মেয়েটি পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ বাংলায় চমৎকার চিঠি লেখে। এই উপন্যাসে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কোনো ছাপ নেই। ধর্মের অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতির প্রতি সমর্থন না জানিয়ে নজরুল তাঁর উপন্যাসে কেবলই মানুষের কথা– তাঁর প্রেম-বিরহ-দেশপ্রেম-জীবনবোধ তুলে এনেছেন। অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপন্যাসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তবে শেষের দু-তিনটি চিঠিতে পুনরাবৃত্তি, প্রয়োজনের অধিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেখা যায়। এবং উপন্যাসের আখ্যানভাগ বা প্লট শিথিল ও সংহতিহীন হয়ে পড়ে। পত্রোপন্যাসে একটা অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে, যদি লেখক চরিত্রানুযায়ী পত্রের ভাষার পার্থক্য না করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপন্যাসে ভাষার পার্থক্য খুব একটা না থাকলেও পত্র লেখার ভঙ্গির পার্থক্যের কারণে চরিত্রগুলোকে আমাদের আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। নূরুল হুদা যখন রবিয়ল ও মনুয়রকে চিঠি লেখে তখন তার বন্ধুসুলভ পরিহাস, সৈনিক-শিক্ষার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধের অবস্থা ইত্যাদি স্থান পায় সেখানে। আবার সে যখন রাবেয়া বা সাহসিকাকে চিঠি লিখেছে তখন শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা দেখা যায় তার মধ্যে। রকিয়া ও আয়েশার পারস্পরিক চিঠিতে সংসার, ছেলে-মেয়ের বিয়ের খবর এসেছে বেশি। রাবেয়া ও সাহসিকার চিঠিতে এবং সোফিয়া ও মাহ্‌বুবার চিঠিতে মেয়েলি সহৃদয়তা প্রকাশিত। শব্দের চয়ন অনেকটা একইরকম। কিন্তু শব্দের বিন্যাসে চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। চরিত্র-সৃষ্টিতেও নজরুল অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম।

আমরা জানি নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গিয়েছেন। যার ফলে আমরা তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে সৈনিক-নায়ক চরিত্র পাই। সেরকম একটি চরিত্র নূরুল হুদা। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসে নূরুলের সৈনিকজীবনের যে চিত্র আমরা পাই তা অনেকটা অভিজ্ঞতাজাত। নজরুলের সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসে মনুয়রের কাছে লেখা নূরুল হুদার পত্রের মাধ্যমে–

> “আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে। দু’দিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা! আমি পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংস পেশীগুলো দেখাতে পারতাম। ...হাজিরা দিয়ে এসে বেল্ট, ব্যান্ডোলিয়র বুট, পট্টি (এসব হচ্ছে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুর-মত সাফ-সুত্‌রো করে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল ‘রুট্ মার্চ’ বা পায়ে হণ্টন।”[৩]

আবার যৌবনে নূরুলের দুরন্তপনার চিত্রও খুঁজে পাওয়া যায় সাহসিকার কাছে লেখা রাবেয়ার পত্রে। নূরুল হুদাকে নজরুল নিজেরই চিন্তা, ব্যক্তিত্ব, উপলব্ধি, রাগ-অনুরাগ দিয়ে গড়েছেন।

নূরুলের দুই বন্ধু রবিয়ল ও মনুয়র ঠিক বন্ধুর মতোই। নূরুলের শুভার্থী হৃদয়বান যুবক। দুই জননীর চরিত্রও দুজন স্বাভাবিক মায়ের মতই উপস্থাপন করা হয়েছে। সংসার ও সন্তানের জন্যই তাদের চিন্তা তবে জননী রকিয়ার চরিত্রটি আমাদের শরৎচন্দ্রের বিন্দু এবং রবীন্দ্রনাথের আপদ-এর কিরণময়ীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ উপন্যাসে প্রধান স্ত্রী চরিত্র মাহ্‌বুবা। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। সে নূরুলকে ভালোবাসলেও বিয়ে করে না। তার প্রেমকে একটু রহস্যময় মনে হয়। রাবেয়া চরিত্রটি সপ্রতিভ, শিক্ষিত, স্বচ্ছন্দ। রাবেয়া চরিত্রের টাইপটি বারবার এসেছে নজরুলের কথাসাহিত্যে।

সোফিয়া চরিত্রটি স্বল্পবাক, অভিমানী, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না অবস্থা। সে নূরুলকে ভালোবাসলেও কখনো প্রকাশ করে নি। প্রেমের বেদনা বুকে নিয়েই মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

নায়ক নূরুল হুদার মতো আর একটি নারী চরিত্র নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। সে চরিত্রটি হচ্ছে সাহসিকা। তার উক্তিতেই তার চরিত্রের স্বরূপ ধরা পড়ে–

> ‘যতদিন না আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর আসবেন ততদিনই আমার সন্ন্যাসিনীই থাকতে হবে বই কি! সংসার না ডাকলে তো আর সংসারী হতে পারি নে নিজে সেধে।’[৪]

চরিত্রচিত্রণ অনেকটা যেন বিবৃতিধর্মী। মাহ্‌বুবা চরিত্র ছাড়া অন্য কোন চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ঘাত-প্রতিঘাত ততটা দেখা যায় না।

উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে নজরুল সরল চলিতরীতিকেই অবলম্বন করেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে কাব্যধর্মী ভাষার ব্যবহার ও ভাবের আতিশয্য দেখা যায়। বর্ণনার আধিক্যের কারণে অনেকসময় উপন্যাসের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে নি।

মৃত্যুক্ষুধা নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস। বস্তির মানুষের মৃত্যু আর ক্ষুধা নিয়ে লেখা এ উপন্যাস। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের বস্তিবাসী নিম্ন শ্রেণির মেহনতি মানুষ প্যাঁকালে, তার মা, তিন ভাবী এবং তাদের ছেলেমেয়ে– এদের দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য, মৃত্যু ও সংগ্রামমুখর জীবনচিত্র ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন এ উপন্যাসে।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটি নজরুলের তিনটি উপন্যাসের মধ্যে অনেক বেশি শিল্পোত্তীর্ণ। এ উপন্যাসটি বিভিন্ন দিক থেকেই মনে দাগ কেটে যায়। বস্তিবাসী মানুষের একমুঠো খাবারেরও সংস্থান নেই, কেবল এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে নজরুলই প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। নজরুলের আগে আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের অভাবের কথা পেয়েছি।

হুগলির বাস তুলে দিয়ে **১৯২৬** সালের ২ জানুয়ারি নজরুল কৃষ্ণনগরে চলে যান। প্রথমে উঠেছিলেন হেমন্তকুমার সরকারের পুরোনো বাড়িতে। তারপর স্টেশন রোডের ধারে অপেক্ষাকৃত একটি ভালো বাড়িতে উঠেন। খ্রিস্টান এক মহিলা ছিলেন বাড়ির মালিক। এলকাটিকে বলা হতো ‘চাঁদ সড়ক ইলাকা’। দরিদ্র মুসলমান ও দরিদ্র খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীদের বাস ছিল এই এলাকায়। খ্রিস্টানদের মধ্যে সকলেই ছিল ধর্মান্তরিত এদেশীয় মানুষ।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের অবলম্বন সেইসব মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়। উপন্যাসের এক ভাগে আছে এইসব মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনি, অন্যভাগে আছে আনসার নামের এক আদর্শবাদী যুবকের ধর্ম, রাজনীতি, মানবতা সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা। এবং সবশেষে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে আনসারের করুণ মৃত্যু। উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই, গরিব খ্রিস্টান আর মুসলমানদের একসঙ্গে বসবাসের চিত্র। এর মধ্য দিয়ে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ফুটে ওঠে। তবে একসঙ্গে বসবাসের ফলে গরিব মানুষগুলোর মধ্যে যে খিটমিট লেগেই থাকে তার চিত্রও তুলির নিপুণ আঁচড়ে অঙ্কন করেছেন নজরুল। এদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> ‘একই প্রভুর পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন গায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে– এরাও যেন তেমনি। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করার মত উৎসাহ বা অবসর নেই বেচারাদের জীবনে।’[৫]

একটি মুসলমান পরিবারের বড় ছেলে গজালেসহ তিন ছেলেই মৃত। তারা রেখে গেছে তিন বৌ আর বারোটি বাচ্চা। এই পরিবারের ছোট ছেলে প্যাঁকালে রাজমিস্ত্রির কাজে মজুর খাটে। আর আছে মা ও স্বামীপরিত্যক্তা বোন পাঁচি। এই বাড়ির মেজ-বৌ খ্রিস্টান হয়ে দুই সন্তানকে ফেলে বরিশাল চলে যায়। সেজ-বৌ ও তার নবজাতক শিশু চিকিৎসার অভাবে ও না খেতে পেয়ে মারা যায়। প্যাঁকালে খ্রিস্টান কুর্শিকে বিয়ে করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অভাবের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারে না তার মা। উপন্যাসের অন্যপ্রান্তে আছে সমাজব্রতী যুবক আনসার। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য তার দ্বীপান্তর হলে সেখানে সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। সাবেক প্রেমিকা রুবি তার সেবা করার জন্য সেখানে

যায়। রুবি অক্লান্ত পরিশ্রম করেও আনসারকে বাঁচাতে পারে না। নিজেও মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

একদিকে মৃত্যু অন্যদিকে ক্ষুধা, মোটামুটি এই হলো *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের কাহিনি। এই উপন্যাসে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। মানবতার জয়গানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মহিমাই চিত্রিত হয়েছে। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের কাহিনিবিন্যাসে শৈথিল্য ও অসতর্কতা থাকলেও বিষয়-গৌরবে ও বর্ণনার গুণে উপন্যাসটি যথেষ্ট সার্থক।

চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মেজ-বৌ চরিত্রটি এ উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র। মেজ-বৌ সমাজে মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য নিজের সন্তানকেও ছেড়ে এসেছিল। এজন্য অবশ্য তাকে কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল, স্বীকার করতে হয়েছিল অনেক ত্যাগও।
আনসার চরিত্রটিকে প্রথমে দেশপ্রেমিক, সমাজব্রতী হিসেবে দেখালেও উপন্যাসের শেষে তার আত্মসংযমের অভাব চরিত্র-গৌরবকে কিছুটা ম্লান করে দেয়। প্যাঁকালে, প্যাঁকালের মা, রুবি ও লতিফাসহ অন্য চরিত্রগুলোও আপন মহিমায় ভাস্বর।

মৃত্যুক্ষুধার ভাষা হিসেবে চলিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এখানে ঔপন্যাসিক নজরুল বাংলা কথ্যভাষার প্রয়োগ এবং তৎসম ও বিদেশি শব্দের ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নজরুলের শেষ উপন্যাস *কুহেলিকা*। কলকাতার এক মেসের পরিবেশকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর। মেসের বিশ-বাইশ জন তরুণ তাকে উল্‌ঝলুল্‌ বলে ডাকে। এ শব্দের অর্থ বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। জমিদারের

ছেলে হয়েও সে সবসময় সাদাসিধে থাকতে ভালোবাসে। বন্ধু হারুণের সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলে হারুণের বোন ভূণী ওরফে তহ্‌মিনার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক হয়। তাদের এ সম্পর্ক জাহাঙ্গীরের মা মেনে নিয়ে পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করতে আসেন। কিন্তু তখন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিপ্লবীকর্মী চম্পার পরিচয় ও দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়।

এসবের পাশাপাশি জাহাঙ্গীরের বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম চলতে থাকে। উপন্যাসের শেষে জাহাঙ্গীর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বিচারে স্বদেশকুমার ছদ্মনামে তার দ্বীপান্তর হয়। সে সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ভূণীকে এবং বাকিটা চম্পাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য তার মাকে বলে যায়। কারণ দেশের নির্যাতিত শত শত নিরন্ন মা, ভাই-বোনদের সেবা হয়তো ভূণী-চম্পার হাতেই সাধিত হবে।

তৃতীয় উপন্যাস *কুহেলিকা*কে নজরুল যেভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে হয়ে ওঠে নি। উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য হলো– ‘নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।’ মেস-এর একটি ঘরে বিশ-বাইশজন যুবক নারীকে পুরুষ কোন চোখে দেখে তারই আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে তরুণ কবি হারুন, আইনের ছাত্র আমজাদ, নববিবাহিত আশ্‌রাফ এবং নায়ক বখ্‌তে জাহাঙ্গীরও আছে। এই পরিচ্ছেদটি পড়লে মনে হয় নারী-পুরুষ সমস্যাই উপন্যাসের বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি খুবই সংক্ষিপ্ত। সম্ভবত শুধু জাহাঙ্গীরের জন্মপরিচয় বা তার শেকড়ের সন্ধান দেওয়ার জন্যই এ পরিচ্ছেদটির অবতারণা করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের পিতা কুমিল্লার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। তিনি এখন প্রয়াত। তার মা-ই জমিদারি দেখাশোনা করেন। জাহাঙ্গীর জেনেছে, তার বাবা চিরকুমার ছিলেন। আর মা ছিলেন কলকাতার এক

বাইজি। এ ঘটনায় জাহাঙ্গীর খুব আঘাত পায়। কিন্তু এ জন্যে মাকে সে দোষারোপ করে নি। এ পর্যায়ে এসে মনে হয় জাহাঙ্গীরের জীবনই উপন্যাসটির উপজীব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর বিপ্লবপন্থী প্রমত্ত'র দলে যোগ দেয়। এ পরিচ্ছেদের দীর্ঘ আলোচনায় বারবার ঘোষিত হয়েছে নজরুলের সামাজিক-রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী চিন্তাচেতনা। এই উপন্যাসেই নজরুলের ধ্যান-ধারণা সর্বাধিক স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত।

> 'ওরে ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভরতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়– এ আমার মানুষের– মহা-মানুষের মহাভারত!'[৬]

এরপর জাহাঙ্গীরকে অবলম্বন করেই কাহিনি অগ্রসর হয়। তার উচ্ছ্বাস, দেশপ্রেম, সৌন্দর্যমুগ্ধতা, বেহিসেবি খামখেয়ালির মধ্যে যেন নজরুলের ব্যক্তিচরিত্রই ফুটে ওঠে। বিপ্লবী সংগঠনের কাজের জন্য তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। ক্রমে দেশপ্রেমের সঙ্গে তার জীবনে জড়িয়ে যেতে থাকে নারী। বন্ধুর বোন তহমিনার সাথে এক মুহূর্তের দুর্বলতায় সে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবধর্মী জয়তীর মেয়ে চম্পার সাথেও তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমকাহিনির সাথে সাথে তার দেশাত্মবোধক কাজ চলতে থাকে। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে দেশপ্রেমের প্রবলতর স্রোতে নর-নারীর প্রেমের সংকটগুলো বড় করে দেখানো হয় না। উপন্যাসের শেষে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় বন্দি হয় জাহাঙ্গীর ও তার সঙ্গীরা।

হিন্দু বিপ্লববাদীদের সাথে মুসলমান যুবক কীভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দেয় ঔপন্যাসিক হয়তো তাই দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু নায়কের নারীঘটিত সমস্যার

কারণে তা যথাযথভাবে ফুটে ওঠে নি। নায়ক জাহাঙ্গীর দেশপ্রেমে দীক্ষা নিলেও প্রকৃত বিপ্লবীর দেশপ্রেম ও আদর্শ তার মনের মধ্যে কখনোই জ্বলে ওঠে নি। তার নিজের স্বীকারোক্তিতেই তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে–

> 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম– ভাবলুম, আগুনে পুড়ে হয় খাঁটি হব– নয় পুড়ে ছাই হব। খাঁটি হতে পারলুম না, এখন ছাই হওয়া ছাড়া আর আমার এ জন্ম থেকে মুক্তি নেই।'[৭]

তহ্‌মিনার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরও চম্পার কাছে তার উক্তি চরিত্র গৌরবকে ক্ষুণ্ন করে–

> 'জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারুর ভালোবাসা পাইনি, আজ তাও যখন পেয়ে গেলুম দৈববলে– তখন আমি বেঁচে গেলুম!'[৮]

বিপ্লবী প্রমত্ত'র চরিত্রটি অঙ্কনে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ছায়া তার চরিত্রের মধ্যেই দেখা যায়।

তহ্‌মিনা চরিত্রটি প্রথমে একটু প্রগলভ মনে হলেও শেষে তার চরিত্রে ব্যক্তিত্বের জোরে সেটি ঢাকা পড়ে যায়।

চম্পা চরিত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো বিকাশ দেখানো হয় নি। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার যে প্রেম দেখানো হয় তা একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও

দেশপ্রেমের সাথে জাহাঙ্গীরের জীবনে দুই নারীর আবির্ভাব সংকটের কারণে উপন্যাসের আখ্যানভাগ শিথিল মনে হয়।

কুহেলিকা উপন্যাসটি সাধু ভাষায় লেখা। তবে সংলাপে আগাগোড়াই চলিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সমাজজীবনে সচরাচর যে ভাষার অনর্গল ব্যবহার হয় *কুহেলিকা*র ভাষা অনেকটা সেরকমই। এর ফলে উপন্যাসটিকে হৃদয়ঙ্গম করা পাঠকের জন্য হয়ে ওঠে অনেক সহজ।

নজরুল-সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট কিছু দিক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নারীচরিত্র-সৃষ্টির কারুকার্য। কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসে সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো স্বমহিমায় ভাস্বর। প্রতিবাদী, দৃঢ়চেতা, প্রেমী, বিপ্লবী-চিত্তের অধিকারী একেকজন নারী। সেই সঙ্গে স্নেহময়িতা আর সারল্য যেন প্রত্যেকটি নারীচরিত্রের ভুষণ। সমাজসেবার মানসিকতাও কোনো কোনো নারীকে করেছে প্রোজ্জ্বল। শাশ্বত বাঙালি মাতৃত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বেশকিছু চরিত্রে। প্রেমিকের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না নজরুলের নায়িকারা।

নজরুলের উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত কাম্য। সমকালীন নারীসমাজের চিত্র পেতে গভীর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে চরিত্রগুলো। পর্যবেক্ষণপ্রসূত বিশ্লেষণ নারীচরিত্রগুলোর শ্রেণি-বিভাজনে ভূমিকা রাখার সহায়ক হতে পারে। তাঁর উপন্যাস তিনটির মূল চরিত্র মোটামুটি আটটি। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র আছে চারটি– মাহ্‌বুবা, সোফিয়া, রাবেয়া ও সাহসিকা। এ ছাড়াও আছে দুটি জননী চরিত্র– রকিয়া ও আয়েশা।

বাঁধন-হারা উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্র মাহ্বুবা। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত হয় পুরো উপন্যাসজুড়ে। সে দরিদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মাহ্বুবার আচরণও পরিশীলিত। ভাবী রাবেয়ার সহায়তায় সে পড়ালেখা, সূচিকর্ম ও গৃহকর্মে পারদর্শিতা অর্জন করে। উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদার সাথে তার বিয়ে পাকাপাকি হয়ে যায়। ঘটনা পরিক্রমায় আমরা মাহ্বুবার দেশপ্রেমের পরিচয় পাই। নূরুল যুদ্ধে যাবে স্থির করলে তাকে সে বাধা দেয় না। কারণ নূরুল দেশের জন্য বড় কাজে যাচ্ছে বলে মনে করে সে।

মাহ্বুবা চায়, প্রেমের পিছুটানে নূরুলের মন যেন বাঁধা না পড়ে। কারণ মাহ্বুবার কাছে ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়। দেশের তরে, দেশের কল্যাণার্থে এভাবে নিজের প্রেমাস্পদকে প্রত্যাখ্যান বাঙালি নারীচরিত্রের আত্মত্যাগী মনোভাবকেই উচ্চকিত করে। এ আত্মত্যাগ পরিচয় বহন করে সর্বোচ্চ ছাড় দেবার মানসিকতার। পরে মাহ্বুবার মামারা তাকে চল্লিশোর্ধ্ব এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এ বিয়েতে সে প্রচুর সম্পদ পায়। পায় না কেবল সুখ। মাহ্বুবা চরিত্রের মধ্যে যে হাহাকার আমরা দেখতে পাই তা থেকে সহজেই অনুমেয়– নারীর কাছে সম্পদের চেয়েও ভালোবাসার মূল্য অনেক। বস্তুত সে মনেপ্রাণে নূরুলকেই ভালোবেসেছিল। এ প্রসঙ্গে সাহসিকার অভিমত স্মরণযোগ্য–

> ‘সে সহজিয়া। সে সহজেই ঐ ক্ষ্যাপাটাকে ভালবেসেছিল, আর এম্‌নি সহজ হয়েই সে তাকে চির-জনম ভালবাসবে। তার বুকে যদি কখনো যৌবনের জল-তরঙ্গ ওঠে, তবে সে খুব ক্ষণস্থায়ী। ...এই সহজ আনন্দে তার সমস্ত কিছু দিতে পেরেছে বলেই তো মাহ্বুবা আজ ছোট্ট মেয়ে হয়েও নিখিল সন্ন্যাসিনীর চেয়েও বড়। তাই সে বৈরাগিণীও হল না, সন্ন্যাসিনীও হল না; ক্রুদ্ধা জননী যখন তাকে এক বুড়ো বরের হাতে সঁপে দিল, তখনো সে সহজেই তাতে সম্মতি দিল। এই সহজিয়ার কিন্তু এতে কোন দুঃখই নেই, সে যে জানে যে, তার যা দেবার তা

Dhaka University Institutional Repository

> অনেক আগেই যে নিবেদিত হয়ে গিয়েছে। অর্ঘ্য নিবেদিত হয়ে যাওয়ার পর শূন্য সাজি বা থালাটা যে ইচ্ছা নিয়ে যাক্, তাতে আর আসে যায় না।'[৯]

বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই বিধবা হয় মাহ্‌বুবা। স্বামীর মৃত্যুর পর সে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু ওই সংসারে সে আর থাকে নি। বৈরাগ্য মনে ভর করে তার। তীর্থস্থান পর্যটনে বেরিয়ে নূরুল হুদার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার জীবনের এ পরিণতির জন্য সে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কিংবা ক্ষোভও প্রকাশ করে নি। এটিও এ চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। নিয়তিকে মেনে নেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় মাহ্‌বুবা চরিত্রে।

এই উপন্যাসের সোফিয়া চরিত্রেও আমরা নারীর চিরাচরিত রূপই দেখতে পাই। সে যেন আমাদের চেনাজানা আটপৌরে নারী। নূরুল হুদাকে ভালোবাসলেও সে তাকে ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি। কিন্তু নূরুল হুদা যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর তার স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য হারিয়ে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে। উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এসবই হয়েছে তার গ্রাম্য-বালিকাসুলভ সারল্যপনার কারণে। শেষপর্যন্ত মনুয়রের সাথে বিয়ে হলেও সে সুখী হয় নি। ধীরে ধীরে মৃত্যুকে বরণ করে নেয় সোফিয়া। এ কথা জানা যায় সাহসিকাকে লেখা নূরুল হুদার চিঠিতে।

সোফিয়া চরিত্রটি মাহ্‌বুবা চরিত্রের মতো এতটা বিকশিত না হলেও তার করুণ পরিণতি আমাদের মনে দাগ কেটে যায়। মনোকষ্ট চেপে রাখার যে চিরাচরিত রূপ বাঙালি নারীচরিত্রে আমরা পাই তার নতুন দৃষ্টান্ত নজরুল তুলে ধরেন সোফিয়া চরিত্রে। নূরুল হুদাকে প্রাণপণে ভালোবাসলেও একটিবার মুখ ফুটে সে বলতে পারেনি– ভালোবাসি! না

পাওয়ার বেদনা ভেতরে ভেতরে কুড়ে কুড়ে খায় সোফিয়ার হৃদয়কে। যন্ত্রণাদগ্ধ সোফিয়া ভালোবাসার মানুষের জন্য নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়।

রাবেয়া চরিত্রটিকে দেখি আর দশজন গৃহবধূর মতোই, স্বামী-সন্তান নিয়েই তার সংসার। সে সময়ের আলোকে যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত, শিক্ষিত। তার কাছেই সাহসিকা ও মাহ্‌বুবা পড়ালেখা শিখেছে। রাবেয়া সপ্রতিভ, নিজের গুণে চারপাশ আলোকিত করতে জানে সে। দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাবেয়া সহজেই আপন করে নিতে জানে তার আশপাশকে, আশপাশের মানুষকে। নারী হিসেবে আমাদের চোখে যারা আদর্শ ঠেকে রাবেয়া যেন তাদেরই প্রতিনিধি।

বাঁধন-হারা উপন্যাসে সাহসিকা চরিত্রটি প্রগতিশীল স্বাধীন নারীর প্রতীক। সাহসিকা নিজে উপার্জন করে, নিজের মতে চলে, অন্যের ধার ধারে না। চরিত্রটিকে নজরুল সাহসী, কুসংস্কারমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন নারীমূর্তি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কেউ কেউ এ চরিত্রটিতে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর সাথে মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সরলা দেবী বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেছেন এবং আত্মনিয়োগ করেছিলেন স্বদেশের কাজে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-'২১) সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। *বাঁধন-হারা* রচিত হয় ১৯২১-'২২-এ।

সরলা দেবীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব তখন সমসাময়িক এবং যথেষ্ট উজ্জ্বল। সাহসিকার আবাসস্থানের ঠিকানা উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে বিডন স্ট্রিট। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নিকটবর্তী এই রাস্তাটি সরলা দেবীকে মনে করেই নির্বাচিত হয়েছিল। সাহসিকা ব্রাহ্ম মেয়ে, কলকাতার একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রথম জীবনে একটা আঘাত পেয়ে সে চিরকুমারী থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র– মাহবুবা,

সোফিয়া, রাবেয়া প্রভৃতি কাছ থেকে একের পর এক চিঠি পেয়েছে। তাদের মনের কথায় পরিপূর্ণ ছিল সেসব চিঠি। এর বিপরীতে সাহসিকা নিজের চিঠিতে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছে, শুনিয়েছে অনেক ভালো ভালো কথা। সাহসিকা চরিত্রের মাধ্যমে নজরুল যেন নিজের মতাদর্শকেই তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সাহসিকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নজরুল যেন নারীমুক্তি আন্দোলনের বার্তাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই চরিত্রটি সম্পর্কে নজরুল গবেষক আবুল হাসান বলেন,

> "বলাবাহুল্য এ উপন্যাসের উজ্জ্বলতম নারী চরিত্র সাহসিকা। তিনি গত যুগে বিশিষ্ট নারী সমাজের মুক্তিদাত্রীদেরই প্রতিভূ। তার কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ–একটি যথার্থ সাহসী নারীর চরিত্র ঝলমল করে ওঠেছে। নজরুলের 'নারী' কবিতায় আমরা যে বীর্যবতী এবং স্নেহময়ী নারীর চেহারা দেখতে পাই তারই স্পষ্ট প্রতিকৃতি এই সাহসিকা।"[১০]

রকিয়া চরিত্রে স্বাভাবিক জননীর মতো সন্তানের প্রতি স্নেহবাৎসল্যই প্রকাশ পেয়েছে। মাহ্‌বুবা ও নূরুল হুদা তার সন্তান না হলেও তাদেরকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। নূরুল যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর তার মঙ্গল কামনায় জন্য রাত-দিন আল্লার কাছে দোওয়া করেছে যাতে সে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসতে পারে।

জননী চরিত্রের দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে মাহ্‌বুবার মা আয়েশার মধ্যে। নূরুল হুদার সাথে মাহ্‌বুবার বিয়ে ভেঙে গেলে ব্যাপারটাকে সবাই মেনে নিলেও তিনি মেনে নেন না। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি জানান–

Dhaka University Institutional Repository

'... আমি বেঁচে থাকতে যদি আমার এই মেয়ের ফের নূরুর সঙ্গে বিয়ে হতে দিই, তবে আমার জন্ম শাহ্জাদ মিয়া দেন নি! মাহ্বুবার বাবার উঁচু মন, তিনি মরণকালে তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে গিয়েছেন, কিন্তু আমি আজো তোমাদের কাউকে ক্ষমা করতে পারিও নি আর পারবোও না।'[১১]

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের প্রধান দুটি নারী চরিত্র হলো মেজ-বৌ ও রুবি। এরা দুজনই প্রতিবাদী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা-সোচ্চার। এমন নারী-চরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে রীতিমতো বিরলই বলা চলে। এ ধরনের চরিত্র এর আগে আমরা খুব কমই পেয়েছি। উপন্যাসের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে মেজ-বৌ। দরিদ্র মুসলিম ঘরের বিধবা সে। একান্নবর্তী পরিবারে গৃহকর্তা বলতে কেউ নেই। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মেজ-বৌ'র দেবর প্যাঁকালে। তার আসল নাম করিম। তিনজন বিধবা বধূ ও স্বামীপরিত্যক্তা কন্যা এবং অনেকগুলি শিশুকিশোর নাতি-নাতনি নিয়ে প্যাঁকালের মা হিমশিম খায়। এই বাড়িরই মেজ-বৌ এক স্বতন্ত্র নারী। নীরবে সেবা করে যায় সকলকে– প্রতিদানের আশা ছাড়াই। সদা হাস্যময়ী মেজ-বৌ'র চরিত্র-চিত্রণে নজরুল তাঁর নারীচেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি যখন কৃষ্ণনগরে অবস্থান করছিলেন তখন নিম্নবিত্ত মুসলিম ও নব্যখ্রিস্টান নারীদের প্রচণ্ড সামাজিক চাপ ও দরিদ্র জীবনযাপন করতে দেখেছেন। বস্তুত তার সেই অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট এসব চরিত্রে। অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকেই তিনি এ উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন। মেজ-বৌ চরিত্রও নজরুলের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত।

মেজ-বৌ আপন স্বভাব-গুণে সকলের প্রিয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই তার অন্ধভক্ত। দুই সন্তানের জননী হলেও তাকে দেখে অবিবাহিতই মনে হয়–

'মেজ-বৌর রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন একটুকু মলিন হয় নি। বর্ষা-ধোয়া চাঁদনির মত আজও ঠিক্‌রে পড়ছে রূপ।'[১২]

বিধবা হলেও মেজ-বৌ পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায়। মাঝে মাঝে রঙিন রেশমি চুড়িও পরে। খোঁপায় গাঁদা কিংবা দোপাটি ফুল গুঁজে দেয়। মেজ-বৌয়ের সৌন্দর্য নজরুলসৃষ্ট অন্যান্য নারীচরিত্রের চেয়ে ব্যতিক্রম। তার সৌন্দর্যে যে-কোন পাঠকমাত্রই বিমোহিত হবেন। ঘোমটায় মেজ-বৌয়ের রূপ ঢাকা থাকলেও ঔপন্যাসিকের অনবদ্য বর্ণনায় তার রূপ যেন আমাদের হৃদয়ে অনুরণনের সৃষ্টি করে। মেজ-বৌয়ের নিটোল হাত আর পাড়ওয়ালা শাড়ির নিচে সাদা পায়রার মতো এক জোড়া পা সেই সঙ্গে সোনার কলসের মতো আধখানা চিবুকের বর্ণনায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। বিধবা হলেও হাতভরা রেশমি চুড়ি আর দশটি বিধবা নারীর চেয়ে পৃথক করে মেজ-বৌকে। 'খেরেস্তানি' কায়দায় শাড়ি পরে মেজ-বৌ। সেই সঙ্গে খোঁপায় গাঁদাফুল গুঁজে দিয়ে নজরুল তার উপন্যাসের এই নারীচরিত্রটিকে করেছেন বিশেষায়িত। আর এর মধ্য দিয়ে নজরুল মেজ-বৌকে সামাজিক ও সৌন্দর্যের অবস্থানের দিক দিয়ে তৎকালীন নারীদের থেকে পৃথক করেছেন।

মেজ-বৌ আপনমনেই গুনগুনিয়ে গান গায়। তাকে মাঝে মাঝে কিছুটা রহস্যময়ীও মনে হয়, কেউ তার তল পায় না। বিধবা হওয়ার পর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে তার স্বামীর বাড়িতেই অবস্থান করছিলো। অথচ আপন বোনের স্বামী ঘাসু মিঞা ওরফে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ তার স্ত্রীর বর্তমানেই শ্যালিকাকে বিয়ে করতে চায়।

এ কাহিনির পরবর্তী সংস্করণ যেন *পদ্মানদীর মাঝি*র কুবের-কপিলা আর মালা। *পদ্মানদীর মাঝি*তে কপিলার লাস্যময়ী আচরণের কারণে কুবের দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রী মালাকে

রেখেই সে শ্যালিকা কপিলার প্রতি আসক্ত হয়। আর *মৃত্যুক্ষুধার* এ পর্যায়ে আমরা দেখি, বৌমাকে অন্যত্র ঘর করতে না দেওয়ার কারণ থেকেই শাশুড়ি তার ছেলে প্যাঁকালের সঙ্গে মেজ-বৌ'র বিয়ের কথা ভাবে। প্যাঁকালে ভাবীকে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। একটি মিথ্যা অপবাদের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে প্যাঁকালে ঘরছাড়া হয়েছে ভেবেই মেজ-বৌ পুরুষের পৌরুষের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বলেছে–

> 'এই আবার পুরুষ, বেটাছেলে! এতবড় মিথ্যার ভয়কে সে উপেক্ষা করে চলতে পারল না। যে মিথ্যা-কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে, সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদের ছুঁড়ে মারতে পারল না। অন্তত অবহেলার হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরি সামনে দিয়ে পথ চলতে পারল না। শেষে কিনা পালিয়ে গেল। হার মেনে! কাপুরুষ!'[১৩]

মেজ-বৌ দেখেছে এ সমাজ মানুষের সুখ-দুর্ভোগে এগিয়ে আসে না। মানুষকে শুধু তিরস্কার, বিদ্রূপ আর শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে। সেজ-বৌ যখন মৃত্যুর প্রহর গুনছে তখন সমাজের কেউ একটিবার খোঁজও নিতে আসে না। সেজ-বৌ'র অসুখে ওষুধ-পথ্যের পয়সা দিয়ে যায় সাহেব ফাদার। ক্ষুব্ধ মেজবৌ তখন বলেছে–

> 'সেজ-বৌর যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না! শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াতকুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়!'[১৪]

সেজ-বৌ এবং তার শিশুর মৃত্যু মেজ-বৌকে এক ধরনের প্রশ্ন আর অভিমানী সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড় করায়–

Dhaka University Institutional Repository

'অনেক ডেকেছি আল্লা, আজ আর তোমায় ডাকব না।'[১৫]

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে খ্রিস্টান দিদিমণির কাছে যায়। লেখাপড়া শিখতে চায়। নার্স-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। মিশনারিদের সঙ্গে তার নিয়মিত মেলামেশা মুসলমান মোল্লাদের সহ্য হয় না। তার পরিবারের লোকেরাও বিরূপ হয়। ক্রমে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে সে। তার ছেলে-মেয়েকেও তার কাছে আসতে দেওয়া হয় না। অবশেষে একদিন সে খ্রিস্টান হয়ে যায়। নাম হয় হেলেন। মুসলমান সমাজে তার নিজের কোনো নামও ছিল না।

মেজ-বৌ'র খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া স্বজাতীয় বদ্ধমূলতা ও অনাচারের প্রতি আরেকটি বড় ধরনের বিদ্রোহেরই প্রমাণ। তার খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার সংবাদে পাড়ার মসজিদের ইমাম প্যাঁকালেদের বাড়িতে 'মৌলুদ ও তৎসঙ্গে বে-ঈমান নাসারদের বজ্জাতি' সম্পর্কে ওয়াজের জলসা বসান। মুসলমান সমাজের কড়া অনুশাসন, স্বজাতীয়দের অনমনীয়তা ও অসহযোগিতায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই মেজ-বৌ খ্রিস্টান হয়ে যায়। আনসার তার কাছে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে বলে–

' আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিস্টান করেছেন!'[১৬]

অনেকগুলি সেবিকা মেয়েকে মিশনারিরা বরিশাল নিয়ে গেলে মেজ-বৌও তার ছেলে-মেয়েকে রেখে সেখানে চলে যায়। সেখানেও সে অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা। সারাক্ষণ চুপচাপ থাকে। অন্যদের মতো সাজগোজ পছন্দ করে না। অন্য মেয়েরা এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে–

> 'আমি ত মেম-সায়েব হতে আসি নি ভাই, মনুষ হতে এসেছিলুম। আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মত শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম।'[১৭]

মেজ-বৌ কেবল মেজ-বৌ হয়ে নয়, একজন মানুষ হয়েই বাঁচতে চেয়েছিল সমাজের আলো-হাওয়ার মধ্যে। এর জন্য নিজের সন্তানকেও ছেড়ে এসেছিল সে। অবশ্য কঠিন শাস্তিও পেতে হয়েছে তাকে। তার খোকার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে পাগলের মতো ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। আর সে বরিশাল ফিরে যায় নি। আবার মুসলমান হয়েছে। এক শিশু হারিয়ে সে বস্তির অনেক অন্নহীন শিশুর ভার নিয়েছে।

এ উপন্যাসের অন্য এক নারী চরিত্র রুবি। সে উপন্যাসের নায়ক আনসারকে ভালোবাসলেও তাকে পায় নি। রুবির বাবা তাকে তার অমতে আইসিএস পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কিন্তু রুবি মোয়াজ্জেমকে কখনো স্বামী বলে স্বীকার করে নি। তার স্বামী মারা যাওয়ার পর সে হিন্দু বিধবাদের মতোই চলতো। বিধবা হওয়ার পর আনসারের সঙ্গে তার আবার আগের মতো স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আনসার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার খবরে তার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়েছে সে। তবে শেষপর্যন্ত নিজের সর্বস্ব দিয়েও মৃত্যুপথযাত্রী আনসারকে বাঁচাতে পারে নি রুবি। নিজেও মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। লতিফাকে লেখা রুবির চিঠির মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে–

> 'আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু-জীবাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন বাকী আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমলিন– নূতন জীবন – নূতন – তারায় – নূতন দেশে – নূতন প্রেম!'[১৮]

এ ছাড়াও এ উপন্যাসে আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে প্যাঁকালের মা। হতদরিদ্র সংসারে এ জননীর চরিত্রের নানা দিক ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের শুরুতেই তার উপস্থিতি ঝগড়ার মাধ্যমে। খ্রিস্টান রমণীর মুসলমান নারীর কলস ছোঁয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বাঁধায়, প্যাঁকালের মা সেখানে অংশ নিয়েছে। খ্রিস্টান পাদ্রিরা যে দারিদ্র্যের রন্ধ্রপথে মানুষকে সেবা দিয়ে, অর্থ দিয়ে খ্রিস্টান করে ফেলে তা তিনি পছন্দ করেন না। তাই খ্রিস্টান রমণীর সাথে তিনিও মেতে ওঠেন ঝগড়ায়। সংসারে অভাব মোচনের জন্য তিনি রাত-দিন পরিশ্রম করতেন। চেয়েছিলেন তিন বিধবা পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিকে নিয়ে একসাথেই থাকতে। কিন্তু তার এ চাওয়া শেষপর্যন্ত পূরণ হয় নি।

সেজ-বৌ মারা যায়, মেজ-বৌ খ্রিস্টান হয়ে বরিশাল চলে যায়। তার ছোট ছেলে প্যাঁকালে খ্রিস্টান কুর্শিকে বিয়ে করে নিজেও খ্রিস্টান হয়ে মাকে ফেলে চলে যায়। এ অবস্থায় তার কিছুই করার থাকে না। তার চারপাশে যেন শুধু অন্ধকার আর নৈরাশ্য। এ হতাশা ভর করার কারণে তার মাঝে আমরা অনেকটা উদ্ভ্রান্ত ভাবও লক্ষ করি। শেষপর্যন্ত চরম দারিদ্র্য ও হতাশার কারণে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় তার ঘরে আলো জ্বালানোর সামান্য তেলটুকু পর্যন্ত ছিল না।

কুর্শি চরিত্রটিও কিছুটা উল্লেখের দাবি রাখে। সে মুসলমান ছিল। কিন্তু পরে খ্রিস্টান হয়ে যায়। কুর্শি প্যাঁকালেকে ভালোবাসে। উপন্যাসের দশ ও এগারো নম্বর পরিচ্ছেদে তাদের তপ্ত-মধুর কাহিনিই তুলে ধরা হয়েছে। কুর্শিকে রোতো কামার অনেক চেষ্টা করেও বিভ্রান্ত করতে পারে নি। সে তার প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল। এখানে তার চারিত্রিক দৃঢ়তার বিষয়টি ফুটে ওঠে। প্রমাণ মেলে চারিত্রিক সততারও।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটিতে বুঁচি নামের একজন প্রাণচঞ্চল গৃহবধূর সাক্ষাত আমরা পাই। তার অন্য নাম লতিফা বেগম। অল্প সময়ের জন্য হলেও উপন্যাসে বুঁচির উপস্থিতি আমাদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। এতো হাঙ্গামার মধ্যেও উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত ও সজীব করে তুলতে বুঁচি চরিত্রের ভূমিকাও নেহাত কম নয়।

পেশা ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে নিম্নশ্রেণির রমণী চরিত্রও আছে এ উপন্যাসে। হিড়িম্বা সেরকমই একটি চরিত্র। সে ছিল ধাত্রী, জাতিতে খ্রিস্টান এবং ভীষণ ঝগড়াটে। হিড়িম্বার চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

> ‘তার ভাষা গজালের মা-র মত ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না! –একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতই!’[১৯]

পাঁচীর সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রীর কাজ সে-ই করেছিল।

নজরুলের তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস *কুহেলিকা*। এ উপন্যাসে নারী সম্পর্কে নজরুলের মানস-প্রবণতা বেশি করে অনুভব করা যায়। নারী কুহেলিকার মতো– এরকম একটি কথা উপন্যাসের শুরুতে বলেছিল জাহাঙ্গীরের কবি-বন্ধু হারুণ। উপন্যাসের শেষে সেই উক্তি পুনরাবৃত্তি হয় জাহাঙ্গীরের কণ্ঠে। কারান্তরালে চলে যাবার সময়ে সে হারুণকে হেসে বলে গেছে– “তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী ‘কুহেলিকা’।” কিন্তু এ উক্তি এক আত্মতৃপ্ত পুরুষের। যার সংকটকালে তার জননী ও দুই প্রণয়িনী সকলেই সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করে তার মঙ্গল কামনায় আত্মনিবেদিত। কেন যে মেয়েরা তাকে এতো ভালোবাসে– এমন একটি উত্তরই যেন অনুক্ত আছে ওই বাক্যে। *কুহেলিকা*র নারীরা সকলেই জাহাঙ্গীরের জন্য

সব দিতে পারে– এই হলো তাদের কুহেলিকাত্বের স্বরূপ। *কুহেলিকা* উপন্যাসের নায়িকা দুজন– ভূণী ওরফে তহ্‌মিনা এবং চম্পা।

*কুহেলিকা*র প্রথমদিকেই তহ্‌মিনার আবির্ভাব। এ উপন্যাসে জাহাঙ্গীরের বন্ধু হারুণের বোন সে। অন্ধ পিতা, উন্মাদ মা ও ছোট দুই ভাইবোন নিয়ে গ্রামেই থাকে। বেড়ানো উপলক্ষে জাহাঙ্গীর হারুণের বাড়ি যায়। জাহাঙ্গীরের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, সদয় ব্যবহার এবং উপঢৌকনে হারুণদের পরিবারের সবাই আকৃষ্ট। এ সময় হারুণের উন্মাদিনী মা তহ্‌মিনাকে ভালো কাপড়চোপড় পরা দেখে অপ্রত্যাশিতভাবে জাহাঙ্গীরের হাতে তুলে দেয়। আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাকেই তহ্‌মিনা নিয়তি বলে মেনে নেয়। এবং অনেকটা আবেগদীপ্ত হয়েই জাহাঙ্গীরকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাকে রেখে কলকাতায় চলে আসার সময় তহ্‌মিনা অভিমানাহত কণ্ঠে বলে–

> '...আপনি ত মহৎ, হৃদয়বান এবং সেইজন্যই হয়ত তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন! আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, স্বেচ্ছায় যাবেন, এতে কারই বা বলবার কি আছে! কিন্তু আমার কি হবে, বলতে পারেন?'[২০]

সে আরও জানায়–

> '...মা যার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই!'[২১]

প্রথমদিকে বয়সের তুলনায় তার কথাবার্তা আচার-আচরণ একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়। ধীরে ধীরে তার এ স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে তাকে একজন আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন নারী হিসেবেই দেখা যায়। জাহাঙ্গীরের কাছে লেখা পত্রেই তার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট–

> ‘যে অধিকার আমার মা আপনাকে দিয়াছেন– সেই অধিকারের দাবী লইয়া যেদিন শুধু আপনি নন্– আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন– সেই দিন হয়ত যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্বে নয়। ...অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরে দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া দাঁড়াইতে পারিব।’[২২]

তবে তার এ প্রেমের মর্যাদা জাহাঙ্গীর দেয় নি। চম্পার সাথে জাহাঙ্গীরের কথাবার্তায় জানা যায়, ভূণীর শেষ সর্বনাশটুকু সে করেছে। তাকে বিয়ে করবে কি করবে না সে সম্পর্কে এখনও সে ভাবে নি। শেষে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর ভূণীর চেয়ে চম্পাকেই বেশি ভালোবাসে।

চম্পা *কুহেলিকা* উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে বিপ্লবী পরিবারের মেয়ে। তার ভাই পিনাকী বিপ্লবী ছিল এবং তার ফাঁসি হয়। তার মা জয়তীও বিপ্লবীদলের সদস্য। জাহাঙ্গীরের ওপর ভার পড়ে কিছু অস্ত্রসহ চম্পাকে গোপনে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার। প্রথম দেখাতেই চম্পার রূপ জাহাঙ্গীরকে আকর্ষণ করে। তার রূপের বর্ণনা দেওয়া হয় এভাবে–

> ‘চম্পা সামনের খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়া বোর্‌কা খুলিয়া ফেলিল। তাহার রূপে সকলের চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া গেল। ভূণীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। সত্য সত্যই

> চম্পার কাছে তাহার রূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ...মা মুগ্ধ নেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, এ রূপ নয়, রূপের শিখা। রূপের চেয়ে তেজ-দীপ্ত আরো বেশি। চক্ষুতে অদ্ভুত জ্যোতি, তাকানো যায় না।'[২৩]

চম্পাও জাহাঙ্গীরকে প্রথম দর্শনে চমকে উঠেছিল। কারণ তার শহীদ ভাই পিনাকীর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের চেহারার অসম্ভব মিল ছিল। ট্রেনেই চম্পা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে সবকিছু জানতে পারে। জাহাঙ্গীরের জীবনের দুঃখের কথা, ভূণীর সাথে তার ভালোবাসার কথা, ভূণীর যে সে চরম সর্বনাশ করেছে সেকথাও সে অকপটে স্বীকার করে। এবং চম্পাকে যে ভালোবাসে সেকথাও জানায় জাহাঙ্গীর। উপন্যাসের শেষে জাহাঙ্গীর তার সম্পত্তির প্রায় সবটুকুই চম্পাকে দিয়ে যায় দেশের সেবা করার জন্য। তবে এ চরিত্রচিত্রণে কিছুটা ত্রুটি ধরা পড়ে। চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ না দেখিয়ে জাহাঙ্গীরের প্রতি তার যে দুর্বলতা দেখানো হয়েছে তা একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়।

এ দুটি চরিত্র ছাড়াও *কুহেলিকায়* রয়েছে তিনটি জননী চরিত্র। এঁরা হচ্ছেন ভূণীর উন্মাদিনী মা, জাহাঙ্গীরের বিধবা মা ফিরদৌস বেগম এবং বিপ্লবী পিনাকী ও চম্পার মা জয়তী।

ভূণীর মাকে উপন্যাসে আমরা পাই একজন উন্মাদিনী হিসেবে। তবে উন্মাদ হলেও ভূণীর সাথে জাহাঙ্গীরের চিরবন্ধনের কথা তিনিই উচ্চারণ করেন–

> 'বাবা! উপরে আল্লা, নীচে তুমি! আমার তহ্‌মিনাকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। দেখো বাবা! এ যেন কষ্ট না পায়! ওই আমার মীনা! আমার নয়নের মণি!'[২৪]

একজন নারীর জীবনে উপযুক্ত স্বামীই যে তার নারী-জীবনের সার্থকতা তা সে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে।

জাহাঙ্গীরের মা ফিরদৌস বেগমকে আমরা স্নেহময়ী জননী-রূপেই পাই। এককালে তিনি কলকাতার ডাকসাইটে বাইজি ছিলেন। জাহাঙ্গীরকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার কারণেই জমিদার হয়েও তিনি সবরকম আভিজাত্য ত্যাগ করে ভূণীর সাথে জাহাঙ্গীরের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। জাহাঙ্গীর জেলে গেলে তাকে ছাড়ানোর জন্য লাখ টাকা খরচ করেন। পুত্রকে ছাড়াতে না পেরে সংসারের প্রতি বিরূপ হয়ে তিনি মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এ উপন্যাসটিতে বিপ্লবী-মাতা হিসেবে পাই জয়তী চরিত্রটিকে। তার পালিত পুত্র পিণাকপাণি। পিণাকপাণিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা জয়তীকে বিপ্লবী হতে বাধ্য করে। তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেন–

> ‘যেদিন পিনাকীর ফাঁসি হয়, সেইদিনই জয়তী গঙ্গাস্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং বজ্রপাণির কাছে স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজ জয়তী বিপ্লবীদের শক্তি-স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।’[২৫]

তার কথাবার্তায় অসাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর যখন তাকে বলে–

> ‘...তোমায় না ভেবে ছুঁয়ে ফেলেছি, তোমায় হয়ত আবার স্নান করতে হবে!’[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

তখন জয়তীর কণ্ঠে শোনা যায়–

> ‘ওকথা বলিস্‌নে বাবা, ও কথা শুন্‌লেও পাপ হয়। মানুষকে মানুষ ছুঁলে স্নান কর্‌তে হয়, মানুষের এত বড় অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল ব’লেই আমাদের এই দুর্দশা। জানিনে তুই কি জাত, কিন্তু তুই যদি হাড়ি-ডোমও হতিস তা’হলেও তোকে ছুঁতে এতটুকু ইতস্তত হত না আমার! ওরে, জন্মটা ত দৈব। যেদিন আরেক জনকে আরেক জাতের ভেবে ঘৃণা কর্‌ব, সেই দিনই আমার স্বাধীনতার মন্ত্র আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে!’[২৭]

পেশা ও সামাজিক অবস্থানে কিছু অন্ত্যজ রমণীর চরিত্র দেখতে পাই তিনটি উপন্যাসে। *মৃত্যুক্ষুধা*র ধাত্রী হিড়িম্বা ও *কুহেলিকা*র জাহাঙ্গীরের মা ফিরদৌস বেগমের ঝি মোতিয়া চরিত্র।

এ ছাড়াও কতিপয় কুমারী ও সদ্যবিবাহিত নারীর পরিচয়ও আমরা পাই। চরিত্রগুলো হলো *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের সাহসিকা, রবিয়লের বোন সোফিয়া, *মৃত্যুক্ষুধা*র হারুণের বোন মোমি। সাহসিকা প্রথম জীবনে দাগা পেয়ে সারাজীবন কুমারী থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত সে তার পণ রক্ষা করেছে।

এ ছাড়াও *মৃত্যুক্ষুধা*র প্যাঁকালের বোন পাঁচিকে স্বামীপরিত্যক্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সন্তানসম্ভাবা হওয়ার কারণে তার স্বামী তাকে তাড়িয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে তুলে আনে। নারীদের অবরোধ ও শাসন-শোষণের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত নেই। এ ক্ষেত্রে যেন সব পুরুষই একই রকম।

এই চরিত্রগুলি মূলচরিত্র না হলেও মূলচরিত্রগুলির পরিপূর্ণ বিকাশে এরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। তাই এই চরিত্রগুলি নির্মাণেও নজরুল অবহেলা বা কার্পণ্য করেন নি।

নজরুলের তিনটি উপন্যাসে আমরা নারীকে একাধিক রূপে পাই। নজরুলসৃষ্ট নারীরা কখনোবা পরাধীন, কখনও তারা স্বাধীন-প্রতিবাদী। আবার কখনও তাদের পাই উভয় রূপেই। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসের সাহসিকা, *মৃত্যুক্ষুধা*র মেজ-বৌ, *কুহেলিকা*র চম্পাকে যথেষ্ট স্বাধীনচেতা ও প্রগতিশীল মনমানসিকতা-সম্পন্নই মনে হয়। এরা সবাই-ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কমবেশি সোচ্চার।

নজরুল যে সময়ে উপন্যাস রচনা করছেন সেসময়ে নারীরা ছিল পরাধীন, সামাজিক শৃঙ্খলে বন্দী। নারীদের পছন্দ-অপছন্দের মর্যাদা পুরুষেরা কখনোই দিতো না। যার প্রমাণ পাই আমরা *বাঁধন-হারা*র মাহ্‌বুবা ও *মৃত্যুক্ষুধা*র রুবির ক্ষেত্রে। মাহ্‌বুবাকে তার মামারা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দেয়। ইচ্ছের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও নিয়তি বলে বিয়েটিকে মেনে নেয় মাহ্‌বুবা। শুধু মাহ্‌বুবাই নয়, রুবির বিয়েও হয় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। রুবিকে তার বাবা তার অমতে আইসিএস পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বিয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করলে মাহ্‌বুবা ও রুবি চরিত্রের মধ্যে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুজনেই তাদের প্রেমের সফল পরিণতি ঘটাতে পারে নি নিজেদের জীবনে। না পাওয়ার বেদনা তাদের মনকে বিষিয়ে তুলেছে। ফলস্বরূপ দুজনের কেউই স্বামীকে মন থেকে মেনে নিতে পারে নি।

মাহ্‌বুবা সারাজীবন নূরুল হুদাকেই ভালোবেসেছিল। রুবিও আনসারের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে ছিল। মাহ্‌বুবা বিধবা হওয়ার পর তীর্থে বেরিয়ে নূরুল হুদাকে যুদ্ধক্ষেত্রে একবার দেখবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। আর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত আনসারের

মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়েছে রুবি। লোকলজ্জার ভয় ঠেলে তাদের এসব আচরণ সত্যিই সামাজিক-অর্গল ভাঙার চেষ্টা বলে প্রতীয়মান। কারণ সে আমলে নারীদের এমন আচরণ উদারভাবে নেওয়ার মানসিকতা সমাজে ছিল না। তাই মাহ্‌বুবা ও রুবি যেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার অগ্রদূত, নারী-স্বাধীনতার অগ্রপথিক।

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম মেয়েরা অনেক অগ্রসর ও স্বাধীন ছিল। তারা ছিল কুসংস্কারমুক্ত ও উদার। যা আমরা রাবেয়ার চিঠির মাধ্যমে জানতে পারি–

> ‘এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বা ছুঁৎমার্গের ব্যামো নেই, কোন সংকীর্ণতা, ধর্ম-বিদ্বেষ, বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব-মানব যা চায়, সেই উদারতা সরলতা সম-প্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে।’[২৮]

সোফিয়া ও সাহসিকার কাছে লেখা মাহ্‌বুবার চিঠিতে মুসলমান পরিবারের মেয়েদের অবরোধ ও বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কথা জানতে পারি। নারীর প্রতি পুরুষের চাপিয়ে দেওয়া নিগ্রহ আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ ও দুঃখের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই–

> ‘তোমরা যে খাঁচায় পুরেও সন্তুষ্ট নও, তার ওপর আবার পায়ে হাতে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে রেখেচ, টুঁটি টিপে ধরেচ,– থামাও, এ সব জুলুম থামাও!’[২৯]

নারীকে পুরুষ কখনও তার প্রাপ্য মর্যাদা বা অধিকার দেয় নি। নারীর পছন্দ-অপছন্দের কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না। মাহ্‌বুবার মামারা এক বৃদ্ধের সাথে তার বিয়ে ঠিক করলে তাকে সেই বিয়েতে মত দিতে হয়েছিল। বিয়েতে স্বাধীন মত দেওয়ার অধিকারও

নারীদের ছিল না। তবে নারীদের অবরোধের পেছনে যে শুধু সমাজের অশিক্ষিত পুরুষরাই দায়ী তা নয়, উচ্চশিক্ষিত পুরুষরাও যে নারীদের কোনো মর্যাদা বা অধিকার দেয় না তা-ই মাহ্‌বুবার কথায় ধরা পড়ে–

> ‘আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্চেন, কিন্তু আমি একে উচ্চশিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্ছেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন, আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোগ চড়ে যাচ্চে। তাঁরা মহিষের মত গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোন কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন।’[৩০]

মাহ্‌বুবার ভেতরে অনেক কথা, তা যেন অনেকটা ছাঁইচাপা আগুন। কিন্তু সে আগুন কখনো জ্বলে ওঠে নি। আর মাহ্‌বুবাও কখনো হয়ে ওঠে নি প্রতিবাদী। সব সয়ে গেছে নীরবে। এ ক্ষেত্রে তাকে আমাদের অনেকটা ‘ইন্ট্রোভার্ট’ই মনে হয়।

নজরুলের উপন্যাসে দেশপ্রেমিক ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও নারীকে তাদের পূর্ণ অধিকার ও সম্মান দিতে পারে নি। নারীর সমস্ত পছন্দ-অপছন্দের ভার তারা নিজেরাই নিয়েছে। তাইতো উচ্চশিক্ষিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পিতাকে দেখি কন্যার পছন্দের কোন মূল্য না দিয়ে তার অমতে বিয়ে দিতে। আঠারো বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছে চল্লিশোর্ধ্ব জমিদার। দেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবকরাও নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা ও অপমান করেছে। *বাঁধন-হারা*র নূরুল হুদা আয়োজিত সম্পন্ন বিয়ে ভেঙে দিয়ে যুদ্ধে চলে গেছে। তার এই রকম আচরণের কারণে একটি নারীর জীবনে কি রকম নিগ্রহ নেমে আসতে পারে তা

একবারও ভাবে নি। *কুহেলিকা*র জাহাঙ্গীর দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রত নিলেও নারীর চরম অবমাননা তার দ্বারাই হয়েছে।

নারী জাতি সম্পর্কে তার ধারণাও ছিল নেতিবাচক–

> "ওদের বিশ্বাস করিনা– শ্রদ্ধা করি না ব'লেই আমার অত ভয়। যাকে শ্রদ্ধা করি না, তার অসম্মান কর্‌তে আমার বাধ্‌বে না।"[৩১]

তিনটি উপন্যাসের কোথাও বিধবার বিয়ে দেখানো হয় নি। যেখানে সমাজের স্পষ্ট অনুমোদন আছে সেখানেও না। মাহ্‌বুবা এক প্রৌঢ় জমিদারকে বিয়ে করে সন্তানের মা হওয়ার আগেই বিধবা হয়। মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহ খুব সহজ হলেও নূরুল হুদা কিন্তু মাহ্‌বুবাকে বিয়ের কথা আর ভাবে নি।

> "যে মাহ্‌বুবা একদিন স্বেচ্ছায় আমাকে পাওয়ার লোভ দু'হাতে ঠেলে দিয়েছিল; আমার মহৎজীবন পাছে বিবাহের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই আমাকে নিজে হাতে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিলে– তাকে যদি আজ অযথা সন্দেহ করি, তা হলে ইহকালে পরকালে কোথাও মুক্তি হবে না, সাহসিকা-দি।"[৩২]

পিতার মৃত্যুর পর কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ছোট ভাইবোনের মুখে অন্ন তুলে দেবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। নিজে স্কুলে পড়ালেখা করার সময়ও যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু সৈনিকজীবন-শেষে ফিরে আসার পর নজরুল মাত্র একবার তাঁর মায়ের সাথে দেখা করতে যান। এরপর তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় তিনি আর কোনোদিন চুরুলিয়ায় যান নি। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁর চাচাকে বিয়ে করেছিলেন। এ ব্যাপারটি নজরুল

কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। হয়তো এ কারণেই তাঁর উপন্যাসে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেন নি তিনি। মাহ্‌বুবা ছাড়াও *মৃত্যুক্ষুধা*র বড়- বৌ, মেজ-বৌ, সেজ-বৌ এবং রুবি বিধবা ছিল। কিন্তু কারোরই দ্বিতীয়বার বিয়ে দেখানো হয় নি।

নজরুলের উপন্যাসে নারীরা প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের থেকে অধিক সংযমী ও একনিষ্ঠ। তিনটি উপন্যাসেই দেখা যায় নারীরা প্রেমে ব্যর্থতা কিংবা সফলতা যাই আসুক তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। পুরুষের মতো নবনব প্রেমের রোমান্স অনুভব করে নি। *বাঁধন-হারা* উপন্যাসে মাহ্‌বুবা নূরুল হুদাকে ভালোবেসেছিল। এবং এ ভালোবাসার জন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর নূরুল হুদা বিয়ে না করেই যুদ্ধে চলে যায়। এই অপমান মাহ্‌বুবার বাবা সইতে না পেরে মারা যায়। মাহ্‌বুবাকে তার মামারা এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের কিছু দিন পরেই সে বিধবা হয়। এতোকিছুর পরও নূরুল হুদার বিরুদ্ধে তার কোনো ক্ষোভ বা রাগ জন্মায় নি। বরং নূরুল হুদাকে পত্র দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

সোফিয়ার প্রেমেও আমরা একনিষ্ঠতা দেখি। নূরুল হুদাকে ভালোবাসার কথা সে প্রকাশ না করলেও নূরুল যুদ্ধে যাওয়ার পর তার পরিবর্তন সবার চোখে পড়ে। মনুয়রের সাথে তার বিয়ে ঠিক হলে সে অনেকক্ষণ কেঁদেছে। মনুয়রকে সে মন থেকে গ্রহণ করতে পারে নি। প্রেমের জন্য সে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে।

*মৃত্যুক্ষুধা*র রুবি চরিত্রেও প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের মহিমা প্রকাশ পায়। আনসারকে সে ভালোবাসলেও তার বাবা তার অমতে বিয়ে দেয় মোয়াজ্জেমের সাথে। মোয়াজ্জেমকে যে সে কোনদিন মন থেকে মেনে নিতে পারে নি তা তার কথায় ধরা পড়ে–

> 'দেখ আনু ভাই, যাকে কোনদিনই জীবনে স্বীকার করি নি কোনো-কিছু দিয়ে, সেই হতভাগ্যেরই মৃত্যু-স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে। সারাটা জিন্দেগী ভরে – নিজেকে এই অপমান করার দায় থেকে কী করে মুক্তি পাই, বলতে পার?'[৩৩]

আনসার কৃষ্ণনগরে আসলে ঘটনাক্রমে মেজ-বৌর সঙ্গে পরিচয় হয়। দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি থেকে মেজ-বৌর প্রতি তার সামান্য হলেও অনুরাগ জন্মায়। কিন্তু রুবির ভালোবাসা সবসময়ই দৃঢ় থেকেছে। আনসার রক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, এ খবর পেয়ে সে ওয়াল্‌টেয়ারে চলে যায় তার সেবা করার জন্য। আনসার মৃত্যুমুখে পতিত তা জেনেও সে তার সর্বস্ব দিয়ে সেবা করতে থাকে–

> 'আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম! যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না, দু'দিন আগে মরবে এই ত! তাছাড়া এ মৃত্যু ত ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু-জীবাণু আমাকেও ত আক্রমণ করবে!'[৩৪]

নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েও সে আনসারকে বাঁচাতে পারে নি। নিজে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, যা লতিফাকে লেখা তার শেষ চিঠিতে জানা যায়–

> 'আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু-জীবাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন বাকী আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমলিন– নূতন জীবন – নূতন – তারায় – নূতন দেশে – নূতন প্রেম!'[৩৫]

প্রেমের জন্য তার এ আত্মত্যাগ তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। প্রেমের প্রতি এতটা সততা, প্রেমাস্পদের জন্য এতটা টান, বাংলা সাহিত্যের খুব কম নারীচরিত্রের মধ্যেই আমরা পাই।

কুহেলিকা উপন্যাসে তহ্‌মিনা জাহাঙ্গীরকে ভালোবেসে তার নারী-জীবনের 'অমূল্য সম্পদ' বিসর্জন দিতেও কার্পণ্য করে নি। কিন্তু জাহাঙ্গীর তহ্‌মিনার চেয়ে চম্পাকেই বেশি ভালোবেসেছে। অথচ জাহাঙ্গীরের প্রতি চম্পার টান কতটুকু ছিল তা নিয়ে আমরা সন্দিহান। তহ্‌মিনাকে এ ক্ষেত্রে ভাগ্যহতই বলা যায়। কারণ সবকিছু দিয়ে, মনেপ্রাণে ভালোবেসেও সে ভালোবাসা পায় নি।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে নর-নারীর পূর্বরাগ, অনুরাগ যা-ই বলি না কেন তা ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি ব্যাপার। কেউ কারও প্রেমে পড়লেও তা প্রকাশ করা যেন ছিল গর্হিত একটি 'অপরাধ'। আর তৎকালীন সমাজের এমন একাধিক চিত্র আমরা পাই নজরুল-সাহিত্যে। নুরুল হুদার কাছে লেখা রাবেয়ার পত্রে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে এখানে কেবল অনুরাগের বিষয়টি তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন নি নজরুল। রাবেয়ার মাধ্যমে পূর্বরাগের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত মতামতও তুলে ধরেছেন তিনি। বলেছেন–

> 'তোমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে মেলামেশা এমনকি দেখাশুনা পর্যন্ত ঘটেনি, এ আমি খুব ভাল করেই জানি, কিন্তু ঐ যে পরের জোয়ান মেয়ের দিকে করুণমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে থাকা, তার মনটি অধিকার করতে হাজার রকমের কায়দা-কেরদানি দেখানো, এ-সব কি জন্য হত? এগুলো ত আমাদের চোখ এড়ায়নি। খোদা আমাদের দুটো চোখ দিয়েছেন, এক-আধটু বুদ্ধিও দিয়েছেন, আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, আমি বড়ডো বুকভরা স্নেহ দিয়েই তোমাদের এ

> পূর্বরাগের শরম-রঙিন ভাবটুকু উপভোগ করতাম, কারণ আমি জানতাম, দু-দিন বাদে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হতে যাচ্ছ, আর তাই আমাদের সমাজে এ পূর্বরাগের প্রশ্রয় নিন্দনীয় হলেও দিয়েছি। নিন্দনীয়ই বা হবে কেন? দুটি হৃদয় পরস্পরকে ভাল করে চিনে নিয়ে বাসা বাঁধলেই ত তাতে সত্যিকার সুখ-শন্তি নেমে আসে। হৃদয়ের এ অবাধ পরিচয় আর মিলনকে যে নিন্দনীয় বলে, সে বিশ্ব-নিন্দুক।'[৩৬]

ওই সময়টাতে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিল অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু-খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরা। শিক্ষা-দীক্ষায়, মেধা-মননে তারা ছিল অগ্রগামী। কিন্তু পিছিয়ে পড়ে মুসলিম সমাজের নারী। তখনকার নারী সমাজ যখন শিক্ষা লাভ করে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে ছিল খানিকটা পিছিয়ে। মুসলিম নারী সমাজ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে ছিল। এ বিষয়টি উঠে এসেছে নজরুলের বিভিন্ন রচনায়।

সে সমাজে মেয়েদের বাংলা ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণকে ভালো চোখে দেখা হতো না। এমনকি নারীদের চিঠিপত্র লেখাও ছিল 'গর্হিত' কাজ । সোফিয়াকে লেখা মাহবুবার চিঠিতে এ বিষয়টি সর্ম্পকে আলোকপাত করা হয়েছে–

> 'সময় কাটবে বলে ভাবিজীর কাছ হতে দু'চারটে বই আর মাসিকপত্র সঙ্গে এনেচি, এই না দেখে এরা ত আর বাঁচে না। গালে হাতে দিয়ে কত রকমেরই না অঙ্গভঙ্গি করে জানায় যে, রোজ কেয়ামত এইবারে একদম নিকটে। একটু পড়তে বসলে চারিদিক থেকে ছেলেমেয়ে বুড়ীরা সব উঁকি মেরে দেখবে, আর ফিস ফিস করে কত কি যে বলবে তার ইয়ত্তা নেই। ... মেয়েদের চিঠি লেখা শুনলে ত এরা যেন আকাশ থেকে পড়ে। মাত্র নাকি এই কলিকাল, এঁরা বেঁচে থাকলে কালে আরও কত কি তাজ্জব ব্যাপার চাক্ষুষ দেখবেন।'[৩৭]

নজরুলের উপন্যাসে পুরুষদের আচরণে নারীরা প্রতারিত, বঞ্চিত, অনেকটা বিভ্রান্ত। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে মেজ-বৌকে তার ভগ্নিপতি অনেক চেষ্টা করেও বিভ্রান্ত করতে পারে নি। কিন্তু পরে মেজ-বৌ আনসারের প্রতি সামান্য দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে রুবির আবির্ভাবে নিজেকে সংযত করে নেয় সে। কুর্শিকে রোতো কামার অনেক প্রলোভন দেখালেও শেষপর্যন্ত সে প্যাঁকালের প্রতি অটল-অবিচল ছিল। *কুহেলিকা* উপন্যাসে জাহাঙ্গীরের দ্বারা তহ্‌মিনা প্রতারিত হয়েছে। ভালোবাসার কথা বলে জাহাঙ্গীর চম্পার করুণাপ্রার্থী হয়েছে। তবে চম্পা তাতে কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়েও শেষপর্যন্ত সাড়া দেয় না।

নজরুলের উপন্যাসে নারীর মাতৃরূপের নানা দিকের উন্মোচন ঘটেছে। উপন্যাসগুলোতে মাতৃমূর্তির বিচিত্র উপস্থাপনা তার ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া বলে মনে করেন সমালোচকেরা। তিনটি উপন্যাসেই জননীদেরকে সন্তানবৎসলা-রূপে পাই। তবে জননী ও সন্তানের সম্পর্কের ভিত্তি কখনোই দৃঢ় ছিল না। এই সম্পর্কের মাঝে কিছুটা জটিলতার আভাসও পাওয়া যায়। *বাঁধন-হারার* রবিয়লের মা নূরুল হুদাকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। মা তাকে একটি চিঠি দিলেও নূরুল কোন জবাব দেয় নি। এবং নূরুলের চিঠিতে মায়ের প্রসঙ্গ তেমন নেই বললেই চলে। *মৃত্যুক্ষুধায়* এক আদর্শ রমণী মেজ-বৌ। কিন্তু সেও তার সন্তানকে ছেড়ে চলে গেল। এজন্য তাকে চরম কষ্টও পেতে হয়েছে। ছেলের মৃত্যুর সময় মা তাকে এক নজর দেখতেও পায় নি। আবার জননীর ছেড়ে যাওয়ার অধিকারকেও নজরুল অস্বীকার করেন নি। তবে মা তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় ছেলে-মেয়ে দুটির জীবন যে শূন্যতায় ভরে গেছে তা তুলে এনেছেন বারবার–

> ‘অন্ধকার ঘরে ক্ষুধাতুর শিশুর মাথার ওপর দিয়ে বাদুর উড়ে যায়– আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মত! ঘুমের মাঝে খুকি কেঁদে ওঠে, “মাগো আমি আব্বার কাছে যাব না!

> আমি তোর কাছে যাব, বরিশাল যাব!” খণ্ড অন্ধকারের মত বাদুড় দল তেমনি পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে যায় মাথার ওপর– রাত্রি শিউরে ওঠে!’[৩৮]

কুহেলিকায় পুত্র জাহাঙ্গীর জননীর অবৈধ সন্তান। যেখানে মাতা-পুত্র পরস্পরকে বোঝেন, ভালোবাসেন। তবু পুত্রের মনে এক দুর্জ্ঞেয় অভিমান, আর মায়ের মনে দ্বিধা। যদিও পরে জাহাঙ্গীর মায়ের প্রতি ক্ষোভ কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক নজরুল কাহিনির শুরুতে মায়ের সাথে পুত্রের তীব্র বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তা থেকে সরে এসেছেন। এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, বাহ্যত সম্পর্ক না রাখলেও নজরুলের অন্তর্জগতে মা জাহেদা খাতুন চিরদিনই বেঁচে ছিলেন। চম্পার মা জয়তীর সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের যে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার পরিচয় উপন্যাসে আছে তা প্রমীলা দেবীর মা গিরিবালা ও পিতৃব্যপত্নী বিরজাসুন্দরী দেবীর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে নজরুলের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও তিনি আজীবন মাতৃস্নেহের কাঙাল ছিলেন। আর সেই স্নেহ-ভালোবাসা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বিরজাসুন্দরী দেবী ও মিসেস এম. রহমানের মধ্যে। এবং *কুহেলিকা* উপন্যাসে জাহাঙ্গীর তার সাক্ষাৎ পেয়েছে হারুনের মা ও জয়তীর মধ্যে।

নজরুলের উপন্যাসে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও আমরা নারীদের উপস্থিতি দেখতে পাই। *কুহেলিকা* উপন্যাসে বিপ্লবী জয়তী ও তার মেয়ে চম্পাকে আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখি। গরুর গাড়িতে করে অস্ত্র বহনের সময় জয়তী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। চম্পা বিপ্লবী জাহাঙ্গীরের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে। অস্ত্রসহ কলকাতায় আসার পথে চম্পা ও জাহাঙ্গীরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পথিমধ্যে অস্ত্রসহ জাহাঙ্গীর ধরা পড়লেও চম্পা পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। বিপ্লবী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকাণ্ডের জন্য বিচারে জাহাঙ্গীরকে দ্বীপান্তর করা হয়। দেশের নিরন্ন ও অসহায় মানুষের সেবা করার জন্য সে তার জমিদারির ভার চম্পার হাতে দিয়ে যায়।

নজরুল যখন উপন্যাস লিখছেন তখন বাংলার সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের মেলামেশা একেবারেই সহজ ছিল না। কল্পনাপ্রবণ কবির কাছে নারীর ছিল এক আলাদা আকর্ষণ। নজরুল সেই আর্কষণে বারবার ধরা দিয়েছেন। এ জন্য তাকে বিবিধ সমস্যায়ও পড়তে হয়েছে। নজরুল একাধারে কবি, শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সংগীতশিক্ষক– সবদিকেই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হওয়ায় বহু নারীর সংসর্গেই তিনি আসতে পেরেছেন। আর সেসব নারী ছিল বিদূষী, গায়িকা, অভিনেত্রী ও সুন্দরী গৃহবধূ। নারী প্রেমের বিচিত্র উপাদান ও অভিজ্ঞতা তিনি বাস্তবতা থেকেই গ্রহণ করেছেন। নিজের জীবন ও উপলব্ধি দিয়ে নারীকে চিত্রিত করেছেন তিনি। তাই হয়তো নজরুলের তিনটি উপন্যাসে তিনজন নায়কের জীবনে দুজন করে প্রেমিকার উপস্থিতি দেখতে পাই। *বাঁধন-হারায়* মাহ্‌বুবা ও সোফিয়া, *মৃত্যুক্ষুধায়* মেজ-বৌ ও রুবি এবং *কুহেলিকায়* তহ্‌মিনা ও চম্পা।

মানসগঠন-বিন্যাসে নজরুলের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কবিতায় নজরুল দেহ-চেতনার প্রমাণ রেখেছেন ভূরি ভূরি। কেবল কবিতায়ই নয় তাঁর উপন্যাসেও সমাজের উপরিতল থেকে নিরন্নবস্তিবাসী পর্যন্ত– সব নায়িকার শরীরেই তিনি সযতনে আরোপ করেছেন সীমাহীন দেহসৌন্দর্যের আধার। তাদের কেউ কেউ অবশ্য 'কামপ্রেরণা-উত্তরণ-প্রয়াসী মানস-সম্পদেও পূর্ণ'। *কুহেলিকা* উপন্যাসের দুই নায়িকা– তহ্‌মিনা ও চম্পা, উভয়কেই নজরুল সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্যময়ী হিসেবে। তবে তাদের সেই সৌন্দর্য দুই ভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের নির্দেশক। তহ্‌মিনার স্বভাবগত স্নিগ্ধমাধুর্য নজরুলের সাহিত্যসুধায় উদ্ভাসিত হয়ে ইঙ্গিতবহতা লাভ করেছে এইভাবে–

> 'ঘোমটার আড়াল হইতে এক জোড়া উজ্জল সুন্দর চক্ষু, ভোরের তারার মত তাহার দিকে চাহিয়া আছে।'[৩৯]

উপন্যাস অপর নায়িকা চম্পার চরিত্র অঙ্কনেও নজরুল ছিলেন যথেষ্ট সৌন্দর্যসচেতন। নজরুলের তুলির আঁচড়ে চম্পার স্বভাবগত কাঠিন্য ও মাধুর্যে একীভূত হয় এইভাবে–

> 'বড় বড় চক্ষু কিন্তু তাহা যেন একটু অতিরিক্ত প্রখর, সহজে চোখের দিকে চাওয়া যায় না। চোখ যেন ঝলসিয়া যায়।'[৪০]

*মৃত্যুক্ষুধা*র মেজ-বৌ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বাঙালি অগ্রসর মুসলিম নারীর প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেজ-বৌ তৎকালীন মুসলিম নারী-সমাজের আধুনিকতার স্মারক। তার মতো তেজস্বী মুসলিম নারীর চিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে কিছুটা দুর্লভই বলা চলে। সমাজের অনিয়ম আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু এই চরিত্রের মাধ্যমে সেই সময়কার বাঙালি নারীর দৈনন্দিন পরিসর ও সৌন্দর্যের আবহ তুলে ধরা হয়েছে। মেজ-বৌ একাধারে দৃঢ় তবে ধীরস্থির, একাকী কিন্তু শক্তিশালী, কঠিন অথচ মমতাময়ী। এই বৈপরীত্য তাকে দিয়েছে অন্যদের চেয়ে ভিন্নতা। করেছে স্বতন্ত্র। একের পর এক মৃত্যু তাকে টলাতে পারে নি। স্বামী-সন্তান-শাশুড়ি বাঙালি নারীর প্রাত্যহিক অবলম্বন। কিন্তু সেগুলোর সবই একে একে হারাতে হয়েছে মেজ-বৌকে। সেই সঙ্গে আছে দারিদ্র্য আর ক্ষুধার কষাঘাত। তবে মেজ-বৌয়ের নিজস্ব জীবনবোধের ছায়ায় সমস্ত অপ্রাপ্তি আর পেয়ে হারানোর বেদনা যেন ধুয়ে-মুছে গেছে। নিজের জন্য পৃথক একটি পথ সৃষ্টি করে নেওয়ার এক অতি-আশ্চর্য ক্ষমতা এবং তার স্বাতন্ত্র্যবোধ আমাদের মোহিত করে। বিত্ত-বৈভবের চেয়ে চিত্তের আহ্বানই সব সময় মেজ-বৌয়ের কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

নজরুলের উপন্যাসগুলোতে নারীচরিত্র-সৃজন প্রক্রিয়া লক্ষ করলে আমরা দেখি– নারীর অবস্থা, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যাবলি প্রায় একই। আর চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ, বক্তব্য আর প্রতিবাদের ভাষাও প্রায় অভিন্ন। রাবেয়া ও সাহসিকা নিজেদের মধ্যকার অভিন্ন স্বাতন্ত্র্যলক্ষণকেই প্রকাশ করেছে। এই চরিত্র দুটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লেখকের চিন্তার পরিধি একই ছিল বলে প্রতীয়মান। আর উপন্যাসের পাতায় রাবেয়া-সাহসিকার আচরণের ক্ষেত্রেও ছিল যথেষ্ট সাদৃশ্য।

নজরুলের নারী-চরিত্রসৃজনে একটি গভীর ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন কাজ করেছে বলে বোধ করি। কারণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে তিনি বিকৃত সমাজগঠনের বিরুদ্ধে একেকটি প্রতিবাদী সত্তার জীবন্ত প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। আমরা জানি, বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এক ধরনের নবতর উন্মাদনার যোগ ঘটে। আর সেসব নবতর ঝোঁক ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যেভাবে ঘটেছে তার প্রভাব তিনি একজন বিজ্ঞানীর মতোই নারীর ওপর আরোপ করে তার ফল পর্যবেক্ষণ করেছেন। নারীসমাজ সর্ম্পকে তাঁর চিন্তা-চেতনার ফসলই হচ্ছে মেজ-বৌ, রুবী, সাহসিকা, রাবেয়া, চম্পাসহ অন্যরা। মূলত তাদের মধ্য দিয়েই তিনি সমাজে এক নবধারার পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। আর ওসব চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমাদের বলতেই হয়, নজরুল শতভাগ সফল এক স্রষ্টা।

নারীগুলোর মধ্যে এক অনন্য অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রমূলে আঘাতের চেষ্টায়ও নজরুল দোর্দণ্ড শক্তির প্রমাণ রেখেছেন। মানুষের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এক অভিনব প্রতিবাদ ছিল চরিত্রগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈপ্লবিক আচরণ, মিথ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানসিকতকা, সমাজের প্রচলিত লোকদেখানো অকারণ রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নজরুলের যে অবস্থান ছিল তা-ই তিনি

পাকাপোক্ত করেছেন নারীচরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন, নজরুলের নারীরা অনেকক্ষেত্রেই গৃহাভ্যন্তরে থেকে পুরুষের তুলনায় শক্তি-সামর্থ্যে দুর্বলতর হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে স্বপ্না রায় তাঁর *নজরুলের দৃষ্টি ও সৃষ্টি* গ্রন্থে বলেন–

> 'নারীর স্বতন্ত্রসত্তার স্বীকৃতি এ কালেরই প্রয়াস। সনাতন ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসের সঙ্গে এর বিরোধ অবশ্যই তীব্র। শক্তি– বিশেষত শারীরিক সামর্থ্যগত-তারতম্য নিঃসন্দেহে নারীপুরুষের চেতনা ও চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলেছে। এ প্রভাবের ফলেই নারীর অবস্থান ও নারীর কাছ থেকে সমাজের প্রত্যাশাও সীমাবদ্ধ থেকেছে গৃহাভ্যন্তরকে আশ্রয় করেই। আর অবলা এবং মমতালক্ষ্মীর রূপদৃষ্টেই সমাজ হয়েছে অভ্যস্ত। কিন্তু শক্তি তো শুধু দেহাশ্রিতই নয়, নানাভাবে ও মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণ করে নজরুল তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধ-চেতনায় স্পষ্ট হয়েছিল নারীকে অবরুদ্ধ রেখে কিভাবে সেই শক্তি অপচয়িত হচ্ছে। তাই নারীর উপস্থিতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন তৎকালীন সমাজ নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে, আরো বিস্তৃত পরিসরে।'[৪১]

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *নজরুল সমীক্ষণ*, ঢাকা, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা–২৬০

২. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, পৃষ্ঠা–৯৯

৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭২৪

৪. ঐ , পৃষ্ঠা–৮০০

৫. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৫৪৯

৬. ঐ , পৃষ্ঠা–৬৫২

৭. ঐ , পৃষ্ঠা–৭১৪

৮. ঐ , পৃষ্ঠা–৭১৫

৯. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭৯৭

১০. *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*; প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, শরৎ ১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৩৪

১১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭৮৫

১২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৫৬৪

১৩. ঐ , পৃষ্ঠা–৫৭৭

১৪. ঐ , পৃষ্ঠা–৫৭৪

১৫. ঐ , পৃষ্ঠা–৫৮৩

১৬. ঐ , পৃষ্ঠা–৬০৩

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা–৬২১

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৩৬

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা–৫৫০

২০. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৭৪

২১. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৭৪

২২. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৯৫

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা–৭০৯

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৭২

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৮৫

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৮৬

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৮৬

২৮. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭৭৫

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৪৯

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৪৯

৩১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭১৩

৩২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৮০৬

৩৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৫৯৭

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৩৬

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৩৬

৩৬. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৭৭৪

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা–৭৪৮

৩৮. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২৫ মে ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা–৬১৪

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা–৬৬৫

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা–৭০৯

৪১. স্বপ্না রায়, *নজরুলের দৃষ্টি ও সৃষ্টি*, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, নজরুল ইনস্টিটিউট, পৃষ্ঠা–১৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সংখ্যার হিসেবে নজরুলের কথাসাহিত্যের পরিধি কমই বলা চলে। নজরুল তাঁর তিনটি উপন্যাস আর তিনটি গল্পগ্রন্থে মোটামুটি ৩০টি নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। নারীচরিত্রগুলিকে তিনি নিজস্ব ভাবনায় গড়ে তুলেছেন। চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজস্ব ভাবনার প্রলেপ থাকলেও সমাজবাস্তবতাকে ভুলে যান নি নজরুল। অস্বীকার করেননি তৎকালীন সমাজের ভালো-মন্দকে। হয়তো তাই তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলো একদিকে যেমন বিদ্রোহীভাবনার প্রতিমূর্তি অন্যদিকে তেমনি সমাজের সংস্কার-শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। নজরুল-কথাসাহিত্যে আমরা ব্যতিক্রমী কিছু নারীচরিত্র পাই। *বাঁধন-হারা*র মাহ্‌বুবাকে সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে যেমন দেখি তেমনি আবার বুড়ো জমিদারের সাথে অসম বিয়েতে নীরব থাকতেও দেখি।

*মৃত্যুক্ষুধা*র মেজ-বৌ সন্তানকে ফেলে চলে গিয়ে যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, নজরুলের আগে বাঙালি কোনো ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃষ্ট কোনো জননী চরিত্রকে এতটা স্বাধীনতা দেন নি। তবে সমাজবাস্তবতার কারণে মেজ-বৌকে খ্রিস্টান থেকে আবার মুসলমান বানিয়েছেন। তিনটি উপন্যাসেই তিনি নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। একই চিত্র পাই তাঁর ছোটগল্পগুলোতেও। বিপথগামী স্বামীকে খুন করতেও পিছপা হন না নজরুল-গল্পের নারীরা। *রাক্ষুসী* গল্পের বিন্দি এর প্রমাণ।

মাতৃত্বের দিক বিবেচনায় একেকজন নারী যেন স্নেহের আধার। সন্তানের ভালোর জন্য তারা সর্বস্ব ত্যাগে সদাপ্রস্তুত। নারীর জননীসত্তার কোমল মূর্তি প্রতিফলিত হয়েছে গল্প-উপন্যাসগুলোর অনেক চরিত্রে।

নজরুল নারীকে সবসময়ই মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। জমিদারের রক্ষিতাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সমাজের উচ্চাসনে আসীন করতেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। প্রেম ও রোমান্টিক

ক্ষেত্রে নারীকে তিনি সংযমী ও আত্মত্যাগী করে গড়ে তুলেছেন। সীমানার লাগাম টেনে ধরতেও ভোলেন নি নজরুল। প্রতিটি নারীর মধ্যে তিনি ঔচিত্যবোধের মাত্রা আরোপ করে স্বকীয়তা দিয়েছেন একেকজন নারীকে।

নজরুলের কথাসাহিত্যে যেসব নারীকে আমরা পাই তাদের সবাই শুধু স্বামী-সন্তান আর সংসার-প্রেম-ভালোবাসায়ই মগ্ন ছিলেন না তাদের কেউ কেউ ভেবেছেন সমাজ নিয়েও। দেশপ্রেমের গভীরতাও অনেক চরিত্রকে দিয়েছে মহিমা। প্রেমের ক্ষেত্রে সকল নারীর পরিণতিই করুণ ও বেদনাঘন। দেশের তরে হবু স্বামীকে যুদ্ধে পাঠানোর নজির রয়েছে একাধিক নারীচরিত্রে।

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নারীর অগ্রণী ভূমিকার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর নারীরা সমাজসচেতন, অধিকারসচেতনও। তবে নজরুলের কবিতায় যেভাবে নারীর বিদ্রোহীমূর্তি ভীষণাকার পেয়েছে সেভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে নারীর বিদ্রোহীসত্তা প্রস্ফূটিত হয় নি। কথাসাহিত্যে নারীর বিদ্রোহীরূপ সে অর্থে তুলে ধরতে পারেন নি নজরুল– কিংবা সচেতনভাবেই নারীর বিদ্রোহের রুদ্রমূর্তি যৎসামান্যই পাঠকের সামনে এনেছেন তিনি।

নজরুলের অবস্থান সবসময়ই ছিল মানবতার পক্ষে আর শোষণের বিপক্ষে। শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সদা প্রতিবাদী নজরুলকে দিয়েছিল বিদ্রোহী-মূর্তি। তাঁর এই বিদ্রোহী-সত্তার স্বরূপ উন্মোচন করতে গেলে দেখা যাবে সেখানে নারীর উপস্থিতি ও অবদান অনন্য-সাধারণ। নজরুলের জীবনেও নারীর মহিমা অত্যুজ্জ্বল। অনুপ্রেরণার অংশ হিসেবে নারী নজরুলের বাস্তবিক জীবনে নানাভাবে ধরা দিয়েছে। তিনি তাঁর জীবন এবং সাহিত্যে নারীর মহিমা-কীর্তনেও কোন কমতি করেন নি। নারী সম্পর্কে এই মহিমা-কীর্তন নজরুলের আধুনিকমনস্কতারই পরিচয় সবসময় উচ্চকিত করেছে। অবশ্য সময়ের

ব্যবধানে নারী কখনও কবিকে করেছে দুঃখী, কখনো বা ভাসিয়েছে চরম সুখে। এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান, নজরুল-কথাসাহিত্যে নারী কেবল প্রিয়তমা হিসেবেই উপস্থিত হয় নি; নারীরা তাঁর রচনায় এসেছে নানা রূপে নানা সুধা নিয়ে। নজরুলসৃষ্ট নারীমূর্তিকে কোথাও দেখি মমতাময়ী মাতা হিসেবে, কোথাও তারা প্রেমময়ী জায়া, আবার কোথাও স্নেহময়ী ভগ্নি। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরে নজরুলের নারীরা একেকজন পরিপূর্ণ অবয়ব নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে।

একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, নজরুলের বাউণ্ডুলে জীবনের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় তিনি বারবারই নারীর কাছেই ফিরে এসেছেন। অবস্থা ছিল এমন, যেন নারীই তার চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল, শেষ ভরসা। তবে একটা বিষয় আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট– নজরুল তাঁর গল্প বা উপন্যাসের কোথাও বিধবাদের বিয়ের পক্ষে ছিলেন না। আর নজরুল খুব সচেতনভাবেই এটি করেছেন বলে প্রতীয়মান। সেই সঙ্গে নজরুল-কথাসাহিত্যের কোথাও সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র সেভাবে ফুটে ওঠে নি।

নজরুলের কাব্যভাণ্ডারের একটা বিশাল অংশ জুড়েই ছিল নারীর সরব উপস্থিতি। কথাসাহিত্যও বাদ যায় নি তা থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নজরুলের সামনে যে অখণ্ড ভারতবর্ষের চিত্র ছিল তা তাঁকে নিদারুণ ব্যথিত করে তোলে। তিনি অনুধাবন করেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বৈ ভারতমাতার সামগ্রিক উন্নয়ন সুদূর পরাহত। এর ফলে নজরুলের সৃষ্টিকর্মে নারীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কবিতায় তো বটেই, গল্প-উপন্যাসগুলোতেও নারীকে উপস্থাপন করেছেন বিশেষ যত্ন নিয়ে।

নারী-পুরুষ সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। এ বিষয়ে নজরুলের মনোভাব ফুটে ওঠে 'নারী' কবিতায়। সেখানে তিনি সরাসরি বলেছেন– 'সাম্যের গান গাই/ আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!' একই চিত্র দেখি

ব্যক্তিজীবনে তিনি একদিকে নারীকে অকৃত্রিম ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন অন্যদিকে নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়ে সাহিত্যের মধ্যে তাদের আসীন করেছেন মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে।

নজরুল প্রবল বিদ্রোহ-সংগ্রামেও নারীর সাহচর্য থেকে নিজেকে দূরে রাখেন নি। এতে করে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মে নারী চরিত্রগুলোয় ছিল স্বাভাবিকতার ছোঁয়া। চরিত্রগুলো যেন আমাদেরই ঘরের কোন পরিচিত জায়া জননী কিংবা কন্যা।

নজরুলসৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো কখনও আত্মসংযমী, কখনও তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, কখনও বা তারা ধৈর্যশীল, আবার কখনও তারা অত্যন্ত সেবাপরায়ণ। তবে সব ছাপিয়ে নারীচরিত্রগুলোতে ফুটে ওঠে শাশ্বত বাঙালি নারীর চিরচেনা অবয়ব। তিনি কেবল নারীর নরম কোমল রূপই তুলে ধরেন নি, মানুষ হিসেবে যে কিছু কুশ্রিতার দিক নারীর মধ্যেও বিদ্যমান তা ফুটিয়ে তুলতেও কার্পণ্য করেন নি। *মৃত্যুক্ষুধা*'য় গজালের মা ও হিড়িম্বার মতো চরিত্র সৃষ্টিতেও নজরুল দিয়েছেন বিশেষ দক্ষতার পরিচয়।

নজরুল নারীকে শুধু সেবাদানকারী হিসেবেই দেখেন নি। সেবাবৃত্তি নারীর নবতর শক্তির আধার, আর সেবামূলক কর্তব্যবোধ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নারী যে বিদ্রোহীও হতে পারে তা নজরুল আমাদের দেখিয়েছেন। নজরুলের ব্যক্তিজীবনে প্রমীলা, নার্গিস কিংবা ফজিলতুন নেসা'র প্রভাবের কথা আমরা জানি। এসব চরিত্র তাঁকে নানাভাবে বিচলিত-

উদ্বেলিত করেছে। নজরুল কখনও তাদের ভালবেসেছেন, কখনও অজানা অভিমানে এড়িয়ে গেছেন, ভালবেসে দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রুবিসর্জনে বিহ্বল হয়েছেন। আর ব্যথাতুর নানান অভিজ্ঞতাসহ নিজের অস্থির জীবন, আত্মত্যাগ ও নারীর প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে গড়ে তুলেছেন সাহিত্যের সোপান।

'নারী' প্রসঙ্গে নজরুল-চেতনার নানান রূপ আমরা পাই তাঁর সৃষ্টকর্মের পরতে পরতে। নারীদের বিষয়ে নজরুলের ভাবনার বলয়, চিন্তাধারা সবসময়ই সমকালীন, সবসময়ই বর্তমান। এজন্যে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। নজরুল-সাহিত্যের নারীরা যেন আমাদের চেনাজানা সমাজেরই বাসিন্দা। আমাদের আপনজন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, ১৩৮০, ডিএম লাইব্রেরি, কলকাতা।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩. আবদুল হাসিব, *নজরুল, নারী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ২০১৩, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

৪. আবু রুশ্‌দ, *নজরুল বিচিত্রা*, বাড পাবলিকেশন, ঢাকা।

৫. আহমেদ মাওলা, *নজরুলের কথাসাহিত্য*, জুন ১৯৯৭, নজরুল ইনস্টিটিউট।

৬. এসএম লুৎফর রহমান, *নারী জাগরণে ধূমকেতু*, মে-আগস্ট ১৯৭৭, উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭. কবীর চৌধুরী, *নজরুল দর্শন*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, নজরুল ইনস্টিটিউট।

৮. গোপাল হালদার, *কাজী নজরুল ইসলাম*, ১৯৯৯, সাহিত্য একাডেমি।

৯. *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

১০. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, ১৯৮৫।

১১. মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, ফেব্রুয়ারি ২০০১, বাংলা একাডেমী।

১২. মাহবুবুল হক, *নজরুল তারিখ অভিধান*, জুন ২০১০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩. মীর আবুল হোসেন (সম্পাদিত), *নজরুল সাহিত্য*, ১৯৬০, ঢাকা।

১৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, ১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নজরুল ইসলাম*, ১৯৬৯, নওরোজ কিতাবস্তান, ঢাকা।

১৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল*, ১৯৮৩, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

১৭. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা* (বিশেষ সংখ্যা), এপ্রিল ২০০১, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

১৮. মোবাশ্বের আলী, *নজরুল প্রতিভা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯. মোবাশ্বের আলী, *নজরুল ও তিন নারী*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

২০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *নজরুল চেতনা*, জুলাই ১৯৯৬, নজরুল ইনস্টিটিউট।

২১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *নজরুল সমীক্ষণ*, ১৩৭৯, আনন্দ প্রকাশনা, ঢাকা।

২২. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম*, ১৯৮৮, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২৩. তপন বাগচী, *নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার*, ২০০০, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২৪. রাজিয়া সুলতানা, *কথাশিল্পী নজরুল*, ১৯৭৫, মখ্‌দুমী অ্যান্ড আহ্‌সানউল্লাহ্‌ লাইব্রেরি, ঢাকা।

২৫. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী*, ২৫ মে ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, ১৯৮৮, কলকাতা।

২৭. শান্তিরঞ্জন ভৌমিক, *নজরুলের উপন্যাস*, ২৫ মে ১৯৯২, নজরুল ইনস্টিটিউট।

২৮. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুল সাহিত্য দর্শন*, জানুয়ারি ১৯৮৩, বাংলা একাডেমি।

২৯. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুল সাহিত্য বিচার*, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা।

৩০. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুলের পত্রাবলী*, ১৯৯৫, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩১. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা*, ২০০০, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩২. সালাউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, ১৯৯৭, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন*, ১৯৮৮, মুক্তধারা, ঢাকা।

৩৪. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*, ১৯৯৫, কলকাতা।

৩৫. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস*, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩৬. সৈকত আসগর, *গদ্যশিল্পী নজরুল*, ১৯৭৯, ঢাকা।

৩৭. স্বপ্না রায়, *নজরুলের দৃষ্টি ও সৃষ্টি*, ১৯৯৯, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, ১৩৮০, ডিএম লাইব্রেরি, কলকাতা।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩. আবদুল হাসিব, *নজরুল, নারী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ২০১৩, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

৪. আবু রুশ্‌দ, *নজরুল বিচিত্রা*, বাড পাবলিকেশন, ঢাকা।

৫. আহমেদ মাওলা, *নজরুলের কথাসাহিত্য*, জুন ১৯৯৭, নজরুল ইনস্টিটিউট।

৬. এসএম লুৎফর রহমান, *নারী জাগরণে ধূমকেতু*, মে-আগস্ট ১৯৭৭, উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭. কবীর চৌধুরী, *নজরুল দর্শন*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, নজরুল ইনস্টিটিউট।

৮. গোপাল হালদার, *কাজী নজরুল ইসলাম*, ১৯৯৯, সাহিত্য একাডেমি।

৯. *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

১০. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, ১৯৮৫।

১১. মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, ফেব্রুয়ারি ২০০১, বাংলা একাডেমী।

১২. মাহবুবুল হক, *নজরুল তারিখ অভিধান*, জুন ২০১০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩. মীর আবুল হোসেন (সম্পাদিত), *নজরুল সাহিত্য*, ১৯৬০, ঢাকা।

১৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, ১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নজরুল ইসলাম*, ১৯৬৯, নওরোজ কিতাবস্তান, ঢাকা।

১৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল*, ১৯৮৩, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

১৭. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা* (বিশেষ সংখ্যা), এপ্রিল ২০০১, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

১৮. মোবাশ্বের আলী, *নজরুল প্রতিভা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

১৯. মোবাশ্বের আলী, *নজরুল ও তিন নারী*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

২০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *নজরুল চেতনা*, জুলাই ১৯৯৬, নজরুল ইনস্টিটিউট।

২১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *নজরুল সমীক্ষণ*, ১৩৭৯, আনন্দ প্রকাশনা, ঢাকা।

২২. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম*, ১৯৮৮, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২৩. তপন বাগচী, *নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার*, ২০০০, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২৪. রাজিয়া সুলতানা, *কথাশিল্পী নজরুল*, ১৯৭৫, মখ্‌দুমী অ্যান্ড আহ্‌সানউল্লাহ্‌ লাইব্রেরি, ঢাকা।

২৫. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী*, ২৫ মে ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, ১৯৮৮, কলকাতা।

২৭. শান্তিরঞ্জন ভৌমিক, *নজরুলের উপন্যাস*, ২৫ মে ১৯৯২, নজরুল ইনস্টিটিউট।

২৮. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুল সাহিত্য দর্শন*, জানুয়ারি ১৯৮৩, বাংলা একাডেমি।

২৯. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুল সাহিত্য বিচার*, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা।

৩০. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, *নজরুলের পত্রাবলী*, ১৯৯৫, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩১. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা*, ২০০০, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩২. সালাউদ্দীন আইয়ুব, *নজরুল সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, ১৯৯৭, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন*, ১৯৮৮, মুক্তধারা, ঢাকা।

৩৪. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*, ১৯৯৫, কলকাতা।

৩৫. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস*, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩৬. সৈকত আসগর, *গদ্যশিল্পী নজরুল*, ১৯৭৯, ঢাকা।

৩৭. স্বপ্না রায়, *নজরুলের দৃষ্টি ও সৃষ্টি*, ১৯৯৯, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নারীরা হাজির হয়েছে তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং নাটকে। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আগল ছিঁড়ে চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে নারীর চরিত্র তিনি এঁকেছেন আপন কল্পনার তুলিতে। জোহরা, মেজ বৌ, রুবী, শিউলি, দুলী কিংবা দোলনচাঁপা তার নারী চরিত্রের মধ্যে অন্যতম।

সামগ্রিকভাবে নজরুলের নারী এক স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত প্রিয়তমা প্রেমের আধার হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই 'বিজয়িনী' কবিতায়।

'তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।/আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি/আপন জেনে হাত বাড়াল/আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,/বিদায় বেলার সন্ধ্যাতারা

পুবের অরুণ রবি/তুমি আমায় ভালোবাস বলে ভালোবাসে সবি।'

গল্প-কবিতা-উপন্যাস এবং গানের কথায় কবি নজরুলের প্রেমিক চোখে নারী কখনও সৌন্দর্যের প্রতীক কখনও বা অধিকারের প্রশ্নে সেই নারী আবার প্রতিবাদী। বর্তমান সামাজিক অবস্থানের আলোকে নজরুলের নারীরা আমাদের সৌন্দর্যের বিষয়ে সৌন্দর্যপ্রেমীদের সচেতন করে তুলছে।

এ প্রসঙ্গে বিউটি এক্সপার্ট তানজিমা শারমিন মিউনি বলেনথ 'সেই সময় দেখা যেত সৌন্দর্যের চর্চায় অতিরিক্ত কোনো কিছুর ব্যবহার ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওপরই নির্ভর করতেন সকলে। তবে ঢেউ খেলানো চুল কিংবা বড় খোঁপা এবং টিপের ব্যবহার তখনকার মতো আমরা এই সময়েও করে থাকি। একটি মার্জিত রূপ সবার কাম্য আর সেই মার্জিত রূপ ফুটিয়ে তুলতে বর্তমানে অনেক মেয়েই আগ্রহী।'

'পদ্ম গোখরো' গল্পের জোহরা চরিত্রটি নজরুলের বর্ণনায় সৌন্দর্যের আলোকে যেমন আলোকিত তেমনি তার মাতৃতৃষ্ণা জোহরা চরিত্রের আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুলাংশে। নজরুলের বর্ণনানুযায়ীথ 'জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে।... আরিফ জোহরা যখন পাশাপাশি দাঁড়াইলো তখন সকলের চোখ জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগীতা।' মাতৃতৃষ্ণার পাশাপাশি স্রষ্টার সৃষ্টি প্রাণীর প্রতি গভীর মায়া এ গল্পের আবহ নির্মাণ করেছে। গল্প পরিক্রমায় দেখা যায়, জমিদার বাড়ির পুত্রবধূ হিসেবে জোহরার আবির্ভাব। নাটকীয়ভাবে অনেক ধন-সম্পদের পাশাপাশি দুটি সাপও চলে আসে এই পরিবারে। সাপ দুটির প্রতি জোহরার আবেগ এবং টান তাকে নিয়ে যায় অন্য কোনো ভুবনে। সাপ দুটিকে সে মনের অজান্তে নিজের মৃত সন্তান হিসেবে ভাবতে থাকে, 'ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাঁধে।' এই গল্পের ভেতর দিয়ে জোহরা চরিত্রটি একই সঙ্গে বাঙালি বধূ এবং মায়ের অন্যরূপ। আশাভঙ্গের বেদনা আর সন্তান হারানোর দুঃখ নিয়ে মৃত্যুই যার শেষ পরিণতি।

'শিউলিমালা' গল্পের প্রধান নারী চরিত্র শিউলির কথা ভুলে গেলে নারীর সৌন্দর্য এবং স্বাধীনতায় নজরুলের ভূমিকাকে ছোট করা হবে। চিরকালীন নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং প্রেম নিয়ে এই গল্প গড়ে উঠলেও মূলত তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ও তাদের জীবনাচরণ গল্পের প্রধান বিষয়। শিউলির গায়ে গোধূলি রঙের শাড়ি আর শুভ্র চেহারা। শিউলি ফুলের মতোই সে সুন্দর। মনের গোপন কথা প্রিয় মানুষটিকে বলতে না পারার যাতনায় শিউলি ফুলের মালা আর সন্ধ্যার লাল রঙের শাড়িতে সজ্জিত হয়ে অবশেষে তাকে অপেক্ষার বিষম যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে হয়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি মেজ বউয়ের মতো তেজস্বী মুসলিম নারীর। এই লড়াকু চরিত্র বিশেøষণে পাওয়া যায় সেই সময়কার বাঙালি নারীর দৈনন্দিন পরিসর ও সৌন্দয্রে আবহ। মেজ বউ যথাক্রমে দৃঢ়, একাকী, শক্তিশালী, মমতাময়ী, স্থির স্বভাবী এবং স্বামীহারা। মৃত্যু, দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর নিজস্ব জীবনবোধের ছায়ায় সমস্ত অস্থিরতা আর অসহযোগিতার মধ্যে থেকেও নিজের জন্য আলাদা পথ তৈরি করে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা এবং তার আপন স্বাধীন চেতনার কাছে ফিরে আসার শক্তি অবলোকনে আমরা মোহিত হই। বিত্তের চেয়ে চিত্তের আহ্বান তার কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে সব সময়। মেজ বউয়ের সৌন্দয্রে বর্ণনা আলাদাভাবে ধরা দেয় উপন্যাসে। ঘোমটায় ঢাকা রূপ তার। শুধু নিটোল দুটি হাত, পাড়ওয়ালা শাড়ির নিচে সাদা পায়রার মতো এক জোড়া পা আর সোনার কলসের মতো আধখানা চিবুক। বিধবা কিন্তু হাতভরা তার রেশমি চুড়ি। 'খেরেস্তানি' কায়দায় শাড়ি পরার পাশাপাশি খোঁপায় গাঁদাফুলথ এমন বর্ণনায় কাজী নজরুল ইসলাম তার উপন্যাসের নারীকে যেমন বিশেষায়িত করেছেন তেমনি বর্তমান সামাজিক ও সৌন্দয্রে অবস্থানের দিক থেকে তৎকালীন নারীদের আলাদা করেছেন।

নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের নারী চরিত্র মাহবুবা ও সোফিয়া তার ব্যক্তিজীবনে আগত নারীদের বাইরে কেউ নয়। 'হেনা' গল্পের হেনা চরিত্রে যেন তার সহধর্মিনী প্রমীলারই অবয়ব ধরা দেয়; যিনি একাধারে আত্মসংযমী, ধৈর্যশীল ও সেবাপরায়ণ। 'রাক্ষুসী' গল্পের 'বিন্দী' চরিত্রটি সামাজিক বাধার বিপক্ষে এক বিদ্রোহী নারীসত্তা।

কাজী নজরুল ইসলামের গানে তার প্রিয় নারীদের কথা উলেøখ করেছেন নানাভাবে। ফুল কিংবা পাখির নামে এইসব নারীদের রূপসৌন্দর্য সব প্রেমিক পুরুষের কাছে আকাঙ্খিত। তার গানের সুর এবং শব্দে দেখা মেলে নারীর রূপ-বিন্যাসের আশ্চর্য প্রতিফলন। এই রূপ শুধু নারীর শরীরী সৌন্দয্রে বর্ণনা নয়। এ রূপ নারীর স্বভাবগত, যা একজন নারী থেকে অন্য নারীতে সঞ্চারিত হয় সময়ের কাল-ধারায়। সংসার চরাচরে কর্মমুখর সব শ্রেণীর নারীর দেখা মেলে তার সাহিত্যে। মোগল হেরেমের মমতাজ মহল কিংবা আহমেদ নগরের সুলতানা চাঁদ বিবি যেমন তার লেখনীতে সৌন্দয্রে প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছে, তেমনি সমান মর্যাদায় রাজদাসী কন্যা আনারকলির রূপ-বৈচিত্র্যকেও শব্দের গাঁথুনিতে আলাদা করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অখ- ভারতের সার্বিক প্রেক্ষাপট কাজী নজরুল ইসলামকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে। জীবন সংগ্রামী নজরুল মনে করতেন নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে ভারতমাতার সামগ্রিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। যে কারণে নজরুল তার সৃষ্টিকর্মে নারীকে এক মহান উচ্চতায় আসীন করতে সচেষ্ট থেকেছেন। তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান সবকিছুতেই নারীকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মমহিমায় উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। নারীর জীবন মহিমা কখনো অনুজ্জ্বল থাকেনি তার সৃষ্টিকর্মে। তিনি একদিকে নারীকে অকৃপণ ভালোবেসেছেন অন্যদিকে নারীর কাছে নানাভাবে ঋণ স্বীকার করে সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি 'নারী' কবিতায় লিখেছেনথ

'সাম্যের গান গাই-

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!

বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,

অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

নরককু- বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয়-জ্ঞান?

তারে বলো, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।'

নারী ছাড়া নজরুলের সাহিত্য কল্পনা করা সম্ভব নয়। তিনি নারী চরিত্রগুলো নিজের দুঃখে, অশ্রুজলে, হাসিতে, কান্নায় সৃজন করেছেন। নিজেই ভেঙেছেন, নিজেই গড়েছেন। নারীরা কখনো লেখকের সৃষ্টিসুলভ কল্পনা নয়, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নারী তার সৃষ্টিকর্মে উঠে এসেছেন স্বমহিমায়। নজরুলের সাহিত্য পাঠ করলে নারীকে বাঙালির জীবনে এক অপরিহার্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিভূ হিসেবে চিন্তা করা যায়। নারীর মহিমা-কীর্তনে তিনি আধুনিকমনস্ক গভীর চেতনাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। নারী একজন মানুষকে যেমন দুঃখী করতে পারে তেমনি নারীই হয়ে ওঠে পার্থিব জীবনের একমাত্র সুখের আধার। নারী যে কেবলমাত্র নজরুলের সাহিত্যে প্রিয়তমা হিসেবে ধরা দিয়েছে তা-ই নয়, এসেছে মাতা, জায়া, ভগ্নি, কন্যাথএমন নানা চরিত্রে। নজরুলের নারীবিষয়ক ভাবনায় লক্ষ্য করা যায় বহু সংবেদের সমাবেশ। তার বোহেমিয়ান জীবনের নানা প্রেক্ষাপটে নজরুলকে বারবার নারীর কাছেই ফিরে আসতে দেখা যায়। নারীই যে মানবের চূড়ান্ত অশ্রয়স্থল, তা তিনি তার লেখনীতে সর্বৈব তুলে ধরেছেন। নানাভাবে নানা ব্যঞ্জনায় তিনি নারী চরিত্র রূপায়ন করেছেন তার সমগ্র সাহিত্যে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি মানুষকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট থেকেছেন সর্বদা। তিনি সমাজ-রাষ্ট্রে সাম্য চেয়েছিলেন। সাম্যবাদ হলো এমনই এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় একটা রাষ্ট্রের বা ভূখ-ের সব সম্পদ জনগণের থাকে এবং যেখানে ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ থাকে। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাম্যের বিকল্প নেই। কিন্তু নারী জাতিকে বাইরে রেখে কখনো সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যে কারণে তিনি সাম্যবাদের এই জাগরণে সমাজের সব শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি 'বারাঙ্গনা' কবিতায় 'বারাঙ্গনা'-কে মা বলে অভিহিত করেছেন। বারাঙ্গনা মায়ের সন্তানদের স্বীকৃতির জন্য তিনি হিন্দু পুরাণসহ বিভিন্ন শাস্ত্র উলেøখ করেছেনথ 'স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,/ কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন/ কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দান-বীর মহারথী/ স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,/ ... বিস্ময়কর জন্ম যাহার- মহাপ্রেমিক সে যিশু!' সুতরাং পাপী নয় পাপকে ঘৃণা কর-এই মহামন্ত্র আদর্শ হিসেবে সাহিত্যে প্রচারিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকল হোক আর সাম্প্রদায়িকতা কী ধর্মান্ধতার চোখরাঙানিই হোকথ যখনই মানবতা দলিত হয়েছে তখনই নজরুলের কণ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, লেখনী হয়ে উঠেছে শানিত ও দুর্বার। তিনি আজীবন নারীর বন্দনা করেছেন, নারীকে জাগাতে চেয়েছেন বহ্নিশিখা রূপে। সৃষ্টির অর্ধেকের কৃতিত্ব দিয়েছেন নারীকে। তার বিখ্যাত গান 'লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া'তে লাইলী'র মনের গভীর আকুতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রযত্ন কুশলতায়। নজরুলের সাহিত্যের বাগান আলো করেন মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, মমতাজ, মুসলিম নারীযোদ্ধা চাঁদ সুলতানা, শিরি-ফরহাদ উপাখ্যানের শিরি, ইরানী বালিকা, পলøী বালিকা, মমীর দেশের মেয়ে, দারুচিনি দ্বীপের নারী, রূপকথার বোন পারুল, বারাঙ্গনা, বেদেনী থেকে কৃষ্ণের আরাধ্য রাধা পর্যন্ত। সামগ্রিকভাবে নজরুলের নারী এক স্বতন্ত্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তার সাহিত্যকর্মে।

'আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,

আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।'

প্রবল বিদ্রোহ ও সংগ্রামেও যে তিনি নারীর সাহচর্য হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাননি- এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ কবিতায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান ও গজলের উৎসে যে নারী চরিত্র নজরুল এঁকেছেন পরম নিষ্ঠায় তা নজরুলের ব্যক্তিজীবনের নারী চরিত্রের সঙ্গে সংশিøষ্ট বললে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। নজরুলের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো কখনো আত্মসংযমী, ধৈর্যশীল ও সেবাপরায়ণ। তিনি যে নারীকে শুধু সেবাকারী হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন ঠিক তা নয়, বরং সেবাবৃত্তিকে নারীর অন্য রকম শক্তিরূপ হিসেবে আবিষ্কার করেছেন এবং কর্তব্যবোধ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নারীকে আবার বিদ্রোহীতে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে সংঘটিত নারী আন্দোলনের বিস্তার নজরুলের নারী নিয়ে ভাবনার মূল উৎস হতে পারে। অথবা তিনি নিজের কর্তব্যবোধ থেকেই নারী জাগরণের এই প্রয়াস পেয়েছিলেন বলেও ধরে নেয়া যায়।

কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ছাড়াও নজরুলের গানের সুর এবং একেকটি শব্দে নারীর রূপ-বিন্যাসের আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমনথ 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেবো খোঁপায় তারার ফুল'। নারীর এই রূপ

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক নারীর গাত্রবর্ণ কিংবা শরীরী সৌষ্ঠব নয়; এ রূপ নারীর স্বভাবগত, যা এক নারী থেকে অন্য নারীতে সন্তরণশীল। সংসার চরাচরে কর্মমুখর সব শ্রেণীর নারীর সমাবেশ তার সাহিত্যে। তিনি মোগল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহল কিংবা আহমেদনগরের স্বাধীন সুলতানা চাঁদ বিবিকে যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন, তেমনি সমান মর্যাদায় রাজদাসী কন্যা আনারকলির রূপবৈচিত্র্যকে শাব্দিক চিত্রণে মহিমান্বিত করেছেন; আবার 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে গজালের মা এবং হিড়িম্বার মতো চরিত্র সৃষ্টিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিনি যখন কোনো নারীর কদর্য রূপ উপস্থাপন করেছেনথ সে রূপ নারীত্বকে অতিক্রম করা মানব-মানবীর আরেক ভিন্ন রূপেরই দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন।

নজরুলের ব্যক্তিজীবনে প্রমীলা, নার্গিস আরা খানম-এসব ব্যক্তিচরিত্র নানাভাবে বিচলিত করেছে। তিনি বহুবর্ণ, বহু বিচিত্র নারী চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের ভালোবেসেছেন, ভালোবেসে দুঃখে কাতর হয়েছেন, অশ্রুবিসর্জন করেছেন; কিন্তু ভালোবাসার পাত্রীকে অভিশাপ দেননি। বরং সেই ব্যথাতুর অভিজ্ঞতা দিয়ে রচনা করেছেন একের পর এক কবিতা, গান। নজরুলের নিজের অস্থির জীবন, আত্মত্যাগ এবং নারীর বিশ্বস্ত থেকে সাহিত্য চর্চা করেছেন। নারীর প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রদর্শনের পরিবর্তে নারীর অন্তর্গত অমিত শক্তিকে উন্মোচিত করে তিনি প্রকারান্তরে সময়কেই অতিক্রম করেছেন। সমাজ-সভ্যতার মুক্তির জন্যে উন্নয়নের জন্যে নারীর অবদান ও অধিকার নিয়ে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। সমাজ পরিবর্তনে নারীর প্রচ-শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছেন। সমাজের মিথ্যা শৃঙ্খলকে ভাঙতে উদ্যোগী হতে নারীদের আহ্বান জানিয়েছেন। নারীকে ভালোবাসতে গিয়ে নজরুল দেখেছেন তার ভালোবাসার নারীরা সমাজ, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদি নানা দিক থেকে বন্দি। তাই তিনি পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে সব বাঁধা সব জিঞ্জির-শৃঙ্খল ভাঙতে চেয়েছেনথ 'মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী'। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় কালজয়ী আহ্বানথ 'ধু ধু জ্বলে ওঠে ধুমায়িত অগ্নি, জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নি!'

নারীর পশ্চাৎপদতা ও তাদের ওপর সমাজ-ধর্ম-গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণতা ও বৈষম্যে নজরুল বিচলিত ছিলেন বলেই তিনি নারী মুক্তির কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটিও। তাই তার দৃপ্ত উচ্চারণ- 'তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো নহ শিখা! তুমি মরীচিকা, তুমি জ্যোতি।.. জনম জন্মান্তর ধরি লোকে লোকান্তরে তোমা করেছি আরতি, বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।' সুতরাং পরিশেষে এ কথা বলা বোধকরি অসঙ্গত নয় যে, নজরুল মানসে নারী যেমন প্রেরণাদাত্রী হিসেবে উপস্থিত তেমনি তার সৃষ্টিকর্মে নারীর অবস্থানও সমাজ বিনির্মাণের এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

নজরুলের গজলের কথা তো শেষ করা যাবে না। 'এত জল ও কাজল চোখ' ----, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে' ---'কে বিদেশী মন উদাসী', 'আধো আধো বোল লাজে বাধো বাধো বোল' ---- এমনি হাজারো জনপ্রিয় গান তিনি রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যগীতির সংখ্যা যেমন বিপুল, জনপ্রিয়তাও তেমনি আকাশচুম্বি। উদাহরণ দিতে গেলে বিভ্রাটে পড়তে হয়, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব। তবু কয়েকটি মাত্র উলে∅খ করেছি- 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল'----, 'নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল', মোর আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম ' ,'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়', 'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়' , 'তুমি শোনতে চেওনা আমার মনের কথা', ---- এমন আরো অনেক গান। নজরুলের সব শ্রেণীর গানেরই এমন অনায়াস জনপ্রিয়তা আর কারও ক্ষেত্রেই দেখা যায়নি। আপামর বাঙালির কাছে এভাবে বাংলা গান পৌছে যাওয়াটা হয়তো অনেকের কাছে ভালো লাগেনি। তাদের চিন্তায় ছিল , বাংলা গানের রস-আস্বাদানের ক্ষমতা থাকবে সীমিত জনের। যাঁরা কবির কাছের জন, বুঝে বা না বুঝে হোক সৃষ্টির পর প্রথম শ্রোতা হওয়ায় এবং বাহবা দেয়ার সুযোগ তাঁদের থাকবে। ঘরোয়া পরিবেশে পরম রসজ্ঞের মতো যাঁরা মাথা দোলাবেন , কবির স্নেহধন্য হওয়ার সুবাদে তা গাইবার সুযোগ পাবেন, বাংলা গান শোনার , বোঝার ও গাওয়ার অধিকার শুধূ তাদের।

ধর্মীয় উম্মদনা ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়েও বর্তমান বিশ্বে ব্যপক কথা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন , " রবীন্দ্রনাথের তপোবন অতীতের স্মৃতি, গান্ধীর রাম রাজ্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন। গান্ধী মোটেও সাম্প্রদায়ক ছিলেন না; ধম্র্রে চেয়ে মানুষ বড় এ তিনি সর্বদাই বলেছেন। কিন্তু গান্ধী যে ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন সেটাও সত্য। কাজটা তিনি শুরু করেননি, মিশ্রনের ব্যধি আগেই ছিল, কিন্তু এই ব্যাধিকে তিনি নিরুৎসাহিত না করে বরঞ্চউৎসাহিত করেছেন।" অপর পক্ষে নজরুল সারা জীবন ছিলেন সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের পক্ষে। এই ক্ষেত্রে গান্ধীজী মানসিক গোলামীতে মজ্জআগত হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে নজরুল ছিলেন স্বাধীন। এ প্রসঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহ ও অবস্থান ছিল লক্ষণীয় , তিনি বিশ্বাস করতেন মর্ম অপেক্ষা আচার সর্বস্বতায় অধিক থেকে অধিকতর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। নজরুলের কথায় কলতে হয়, "আজাদ আত্মা, আজাদ আত্মা সাড়া দাও সাড়া, এই গোলামীর জিঞ্জির ধরি ভীম বেগে দাও নাড়া।'

এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফার মূল্যায়নও প্রনিদান যোগ্য। তিনি বলেন, "তবে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে নজরুলের দু'ধরনের স্থির বিশ্বাস ছির। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্য পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন।" তিনি আরও বলেন , " নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা যোগসুত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তার তো কোন তুলনা হয় না।"

শুরুতেই বলেছিলাম কোন জাতির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙন যতবেশি শক্তিশালী হবে তার মর্যদাও ততবেশি বৃদ্ধি পায় এবং সে জাতি তত বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে বিশ্ব দরবারে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দু'জনের কাছেই আমরা ঋণী। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফার মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "আজীবন সুন্দরের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দুমূর প্রচেষ্টারই তো নাম রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর ঐকিন্তিকতা ধর্ম প্রচারকের চাইতে কোনো অংশে কম ছির না। অত্যন্ত সুকুমল, সংবেদসশীল , স্পর্শকাতর, শ্রদ্ধারভারে আনত একখানা মন নিয়ে তিনি যেন প্রচারকের ভূমিকায় নেমেছিলেন। কিন্তু প্রচারকের লেবাস তিনি কখনো অঙ্গে ধারণ করেননি।" অন্যদিকে নজরুল সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "নজরুলের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের ভাষাহীন পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালী সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যিক বাঙলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করে নব বিকাশধারায় ভিত্তিপত্তর স্থাপন করে অনেকদূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মান করেছিলেন।" তাই স্পষ্ট করেই বলতে পারি বাঙালি সম্বন্ধে নজরুলের দু'ধরণের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্য পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থ্যাৎ নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন , তার কোনো তুলনা হয় না। অতএব আহমদ ছফর ভায়ায় বলা যায় বাঙালি মুসলামান সমাজ শিল্প এবং সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে নজরুলের মতো আর কারো কাছে অত বিপুল ঋণী নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সবাইকে মুগ্ধ করে তাঁর কথা সুর ও ভিন্নতার জন্য। তাই এক্ষেত্রে রবীন্দ্র জয়জয়কার সর্বত্র। কিন্তুসঙ্গীতে নজরুল প্রকৃত অর্থেই খুবই শক্তিশালী এবং ভিন্নতার জন্য বাংলার সংস্কৃতিকে কত সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, তার ঋণ কখনই শোধ করা যাবে না। এর পরেও কেন নজরুলের সঙ্গীত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মূল্যায়িত হয়না , সে প্রশ্ন সবার কাছে।

নজরুলের সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটু খেয়াল করলেই বুঝঅ যাবে শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, বৈচিত্রের দিক থেকেও তাঁর আগের কোন সুরকার তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। তিনি কোনক্রমেই ঝড় তুলতে পারতেন না, যদি না তাঁর গানের কথায় ও সুরে নবতর বৈশিষ্ট্য, নতুন রঙ সঞ্চালন করতে পারতেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন নজরুলের বিশাল সুরম-লের মধ্যে মুসলমানী দরবারী ঐতিহ্য, লোকসঙ্গীতের ভাবধারা, আরব, ইরান, এমনকি ইউরোপীয় সুরের প্রভাবও তাঁর গানকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে।

তিনি সর্বত্র সুরের অন্বেষণ করেছেন। বাংলার সকল শ্রেষ্ট গীতিকার ও সুরকারদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন একথা নি:সংকোচে বলা যায়, নজরুলের সাথে বাংলা সঙ্গীত যেভাবে সুর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ইতিপূর্বে

আর কোনদিন তেমনটি হতে দেখা যায়নি। সুরের এই মৌলিক অবদানের জন্য নজরুলগীতি ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আর আব্বাস উদ্দিন নজরুলের গানকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, " সুরকার নজরুলের জীবন একটা বহু রাগ-রাগিনী বিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ। এককথায় নজরুল আজ পর্যন্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ট কম্পোজার বা সুরকার হয়ে আছেন।"

অর্থ্যাৎ নজরুল যে বাংলা গানের একজন সেরা পর্যায়ের দিকপাল স্রষ্টা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকেনা। বাংলা গানের সুরের মাতোয়ারা ভাব তিনিই সবচেয়ে বেশি সংযোজন করেছিলেন। রঙ-রসের বৈচিত্রে ও তাঁর গানকে অনন্য বলা যায়। এত বিচিত্র সুরের গান আর কোনো বাঙালি সুরকার রচনা করেছিলেন কিনা জানা নেই।

বাংলাগানের জগতে তাঁর বিশেষ অবদান নজরুলের গজল, নজরুলের ঝুমুর, নজরুলের শ্যামা-সংগীত , নজরুলের ইসলামী গান। এই পর্যায়ের গানগুলোর তুলনা চলেনা। এক নতুন গায়কী ধারায় বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর হারমনি ও রাগ সংগীত গুলোর কথা মনে হলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কত বড় সঙ্গীত সাধক হলে তাঁর পক্ষে সতেরোটির মতো নতুন রাগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

নজরুল তাঁর রচনার-বিশেষ করে কবিতা ও গানের ভাষায় সমগ্র বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে ধারণ করেছেন এবং বিষয়, ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন রূপে ব্যবহার করেছেন। তাই বলা চলে বাংলা সাহিত্যের দুই যুগস্রষ্টা কবি-মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও- নজরুলের মতো এতো ভাষা-বৈচিত্রের সাধক নন। কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি যেকোন বিভেদকে মুছে দেয় এবং অন্য সংস্কৃতির সাথে নিজেদের মিলনের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী করে থাকে। আর নজরুরের মতো বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবি হিন্দু-মুসরমানদের জাগরণমূলক এবং তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ক এত বেশি সংখ্যক কবিতা, গান- বিশেষত কীর্তন, ভজন, দেবস্তুতি, হামদ্, নাত ইত্যাদি লিখেছেন কি? ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিশেষ রচিত তাঁর কবিতা গানে তিনি অবলীলায় মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দ, উপমা, উপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। অন্যপক্ষে হিন্দু ঐতিহ্য মূলক বিষয় তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতি, হিন্দি ইত্যাদি শব্দ, বাকবন্ধ, উপমা, উপ্রেক্ষা, হিন্দু-মুসলমানে মিলনে বিশ্বাসী নজরুল বলেছেন, "বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভযেরই সাহিত্য, এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানদের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুদেরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য -প্রলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্য দেখে ভ্রু কুঁচকানো অন্যায়।' তিনি অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁকে লিখিত এক পত্রে উলেøখ করেন, "আমি হিন্দু-মুসলমানদের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী । --- তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ

ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নেই।" তাই আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির, মুক্তির পুরানো সমাজ ভেঙ্গে নতুন ও উন্নত সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভেদের এবং সঙ্কীর্ণতার আগল ভেঙ্গে নতুন ঐতিহ্য গড়ার ধারা সৃষ্টি করে গেছেন, রেখে গেছেন অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

বিশ শতক পেরিয়ে আমরা একুশ শতকের প্রথম দশকে প্রবেশ করেছি। এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বদলে এসেছে বিশ্বায়ন, উপনিবেশিক শোষনের স্থান নিয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতি , জাতীয় সংস্কৃতিকে গ্রাস করে ফেলেছে আকাশসংস্কৃতির বিকিরণে অপসংস্কৃতির বাতাবরণ। আজ তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে জটিল সমস্যা ওই প্রভুত্ব থেকে স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রাখা আর সে জন্য প্রয়োজন একই সঙ্গে স্বদেশি ও আন্তর্জাতিক হওয়া। নিজের জাতিসত্তার ও সংস্কৃতির প্রতি অবিচল থেকে আন্তর্জাতিক হওয়া। আজকের পৃথিবীতে কোন দেশ-জাতি নির্জন দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা। আজ তাকে নিজের মাটিতে আপন ঐতিহ্যের শেকড় গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত করে দাঁড়াতে হবে। নজরুলের মতো বলতে হবে, " বল বীর/ বল উন্নত মম শির,/ শির নেহারি আমারি নতশির ওই শির হিমাদ্রির।"

এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় যদি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলেই মানুষ স্বাধীন চিত্ত সত্বার জাগরণ ঘটাতে পারবে। পরাধীন যুগের স্বাধীন কবি নজরুল বারবার স্বদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিত্ততার জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি প্রথমে মনের শিকল ভেঙ্গে পরে হাতের শিকল ভাঙ্গার কথা বলেছেন। নজরুলের ভাষায়, "মনের শিকল ভেঙ্গেছি, এবার হাতের শিকলে পড়েছে টান।"

বাংলার মানুষের বীরোচিত সংগ্রাম আর বিজয় গাঁথা আজও সঠিকভাবে রচিত হয়নি বরং বারবার বিকৃত হয়েছে আজ আমাদের প্রয়োজন নজরুলের মতো অকোতভয় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কবি সাহিত্যিকের যিনি বাংলার সাহসী সন্তানদের সংগ্রামকে সাহিত্যে তুলে আনবেন, এ দেশের দু:খী মানুষকে সাহসও প্রেরণা জোগাবেন মানবতার জয়ের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাতে মানুষ আশাহত না হয়ে, উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

নজরুল যেমন তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্যদিয়ে বিশ শতকের প্রথম চার দশকের পরাধীন দেশের মানুষের মর্মজ্বালাকে ছন্দে গানে তুলে ধরে ভীতি তুচ্ছ করে উপনিবেশিবাদ, সামান্তবাদ এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। আজকের বাংলাদেশে তেমন কবিও সবচেয়ে বেশি। মানুষ আজ হতাশ এবং বিভ্রান্ত এই অবস্থা থেকে প্ররিত্রানের পথ প্রদর্শন করতে পারেন নজরুলের মতো মানবতাবাদী এবং

সংগ্রামী শিল্পী-সাহিত্যিক যিনি আন্তর্জাতিক স্বাথের্র রক্ষক দেশীয় তাঁবেদারদের মুখোস উন্মোচন করতে পারেন নির্ভয়ে , নিসঙ্কোচে। নজরুল পরাধীন দেশের মানুষকে অগ্রযাত্রার পথপ্রদর্শনের জন্য নজরুলের মতো নির্ভয় মানুষের প্রয়োজন, যিনি সত্য কথা বলতে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতিকে বিবেচনায় আনবেন না। নজরুলের কবিতায় তিনি যেমন বলেন, " সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচালীর খাঁড়ায়/ নেই কিরে কেই সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়? " আজ নজরুলের মতো তেমন দীপ্ত উচ্চারণ প্রয়োজন। নজরুল পরাধীন দেশের দু:শাসন সম্পর্কে লিখেছেন, " বলরে বন্য হিংস বীর/ দু:শাসনের চাই রুধির।" সে জন্যেও নজরুলের মতো সাহসী উচ্চারণ প্রয়োজন্ নজরুল তথাকথিত বুদ্ধীজীবীদের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলেছেন তা দিয়ে শেষ করব। তিনি বলেন, " দোহাই তোদের এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল/ ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড় ঢের মিথ্যা চল।

যে কোন দেশ, জাতি বা ব্যক্তির আত্মপরিচযে়র মূল স্তম্ভ সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতির প্রকাশ প্রায়ে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। উদাহরণসরূপ বলতে পারি বাংলাদেশের মানুষ আত্মপরিচযে়র জন্য দীর্ঘ দিন ধরে দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগছিল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাব নতুন দিগন্ত সূচনা করেছে সবার মাঝে। দিয়ে ‡ছ এক সম্মানের স্থান বিশ্ব দরবারে। কিন্তু কোন দেশের সংস্কৃতির ভীত একজন ব্যক্তির উপর নিভ্রর করে তৈরি বা নির্মান হতে পারে না। তার প্রভাবে হোক বা স্বকীয়ে বৈশিষ্ট্যে হোক আরো নতুন মাত্রা যোগ করে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

‡কান জাতির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন যতবেশি শক্তিশালী হবে তার মর্যদাও ততবেশি বৃদ্ধি পায়ে এবং সে জাতি তত বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে বিশ্ব দরবারে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দু'জনের কাছেই আমরা ঋণী। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফার মূল্যাযে়ন প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "আজীবন সুন্দরের সঙ্গে সতে ¨র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দুমু্র প্রচেষ্টারই তো নাম রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর ঐকিন্তিকতা ধর্ম প্রচারকের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। অত্যন্ত সুকুমল, সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর, শ্রদ্ধার ভারে আনত একখানা মন নিয়ে তিনি যেন প্রচারকের ভূমিকায়ে নেমেছিলেন। কিন্তু প্রচারকের লেবাস তিনি কখনো অঙ্গে ধারণ করেননি।"

অন্যদিকে নজরুল সম্পর্কে মূল্যাযে়ন করতে গিয়ে বলেন, "নজরুলের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের ভাষাহীন পরিচয়ে ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন। আর নজরুলের কাছে সমগ্র বাঙালী সমাজের ঋণ এই যে, নজরুল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যিক বাঙলার হিন্দু-

মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করে নব বিকাশধারায় ভিত্তিপত্তর স্থাপন করে অনেকদূর পর্যন্ত গাঁথুনি নির্মান করেছিলেন।”

তাই স্পষ্ট করেই বলতে পারি বাঙালি সম্বন্ধে নজরুলের দু’ধরণের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্য পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থ্যাৎ নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তার কোনো তুলনা হয় না। অতএব আহমদ ছফর ভাষায় বলা যায় বাঙালি মুসলামান সমাজ শিল্প এবং সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে নজরুলের মতো আর কারো কাছে অত বিপুল ঋণী নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সবাইকে মুগ্ধ করে তাঁর কথা সুর ও ভিন্নতার জন্য। তাই এক্ষেত্রে রবীন্দ্র জয়জয়কার সর্বত্র। কিন্তু সঙ্গীতে নজরুল প্রকৃত অর্থেই খুবই শক্তিশালী এবং ভিন্নতার জন্য বাংলার সংস্কৃতিকে কত সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, তার ঋণ কখনই শোধ করা যাবে না। এর পরেও কেন নজরুলের সঙ্গীত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মূল্যায়িত হয় না, সে প্রশ্ন সবার কাছে।

নজরুলের সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, বৈচিত্রের দিক থেকেও তাঁর আগের কোন সুরকার তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। তিনি কোনক্রমেই ঝড় তুলতে পারতেন না, যদি না তাঁর গানের কথায় ও সুরে নবতর বৈশিষ্ট্য, নতুন রঙ সঞ্চালন করতে পারতেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন নজরুলের বিশাল সুরমণ্ডলের মধ্যে মুসলমানী দরবারী ঐতিহ্য, লোকসঙ্গীতের ভাবধারা, আরব, ইরান, এমনকি ইউরোপীয় সুরের প্রভাবও তাঁর গানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে।

তিনি সর্বত্র সুরের অন্বেষণ করেছেন। বাংলার সকল শ্রেষ্ট গীতিকার ও সুরকারদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন একথা নিঃসংকোচে বলা যায়, নজরুলের সাথে বাংলা সঙ্গীত যেভাবে সুর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ইতিপূর্বে আর কোনদিন তেমনটি হতে দেখা যায়নি। সুরের এই মৌলিক অবদানের জন্য নজরুলগীতি ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আব্বাস উদ্দিন নজরুলের গানকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, “সুরকার নজরুলের জীবন একটা বহু রাগ-রাগিনী বিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ। এককথায় নজরুল আজ পর্যন্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ট কম্পোজার বা সুরকার হয়ে আছেন।”

অর্থাৎ নজরুল যে বাংলা গানের একজন সেরা পর্যায়ের দিকপাল স্রষ্টা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বাংলা গানের সুরের মাতোয়ারা ভাব তিনিই সবচেয়ে বেশি সংযোজন করেছিলেন। রঙ-রসের বৈচিত্রে ও তাঁর গানকে অনন্য বলা যায়। এত বিচিত্র সুরের গান আর কোনো বাঙালি সুরকার রচনা করেছি লন কিনা জানা নেই।

বাংলাগানের জগতে তাঁর বিশেষ অবদান নজরুলের গজল, নজরুলের ঝুমুর, নজরুলের শ্যামা-সংগীত, নজরুলের ইসলামী গান। এই পর্যায়ের গানগুলোর তুলনা চলে না। এক নতুন গায়কী ধারায় বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর হারমনি ও রাগ সংগীতগুলোর কথা মনে হলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কত বড় সঙ্গীত সাধক হলে তাঁর পক্ষে সতেরোটির মতো নতুন রাগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়!

নজরুল তাঁর রচনার-বিশেষ করে কবিতা ও গানের ভাষায় সমগ্র বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে ধারণ করেছেন এবং বিষয়, ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন রূপে ব্যবহার করেছেন। নজরুরের মতো বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবি হিন্দু-মুসলমানদের জাগরণমূলক এবং তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ক এত বেশি সংখ্যক কবিতা, গান; বিশেষত কীর্তন, ভজন, দেবস্তুতি, হামদ্, নাত ইত্যাদি লিখেছেন কি? ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিশেষ রচিত তাঁর কবিতা গানে তিনি অবলীলায় মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দ, উপমা, উপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন।

অন্যপক্ষে হিন্দু ঐতিহ্য মূলক বিষয় তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতি, হিন্দি ইত্যাদি শব্দ, বাকবন্ধ, উপমা, উপ্রেক্ষা। হিন্দু-মুসলমানে মিলনে বিশ্বাসী নজরুল বলেছেন, "বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভযেরই সাহিত্য, এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানদের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুদেরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য-প্রলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্য দেখে ভ্রু কুঁচকানো অন্যায়।" তিনি অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁকে লিখিত এক পত্রে উলেøখ করেন, "আমি হিন্দু-মুসলমানদের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী...। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নেই।" তাই আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির, পুরানো সমাজ ভেঙ্গে নতুন ও উন্নত সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভেদের এবং সঙ্কীর্ণতার আগল ভেঙে নতুন ঐতিহ্য গড়ার ধারা সৃষ্টি করে গেছেন, রেখে গেছেন অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

বিশ শতক পেরিয়ে আমরা একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রবেশ করেছি। এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বদলে এসেছে বিশ্বায়ন, উপনিবেশিক শোষণের স্থান নিয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতিকে গ্রাস করে ফেলেছে আকাশসংস্কৃতির বিকিরণে অপসংস্কৃতির বাতাবরণ। আজ তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে জটিল সমস্যা ওই প্রভুত্ব থেকে স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রাখা আর সে জন্য প্রয়োজন একই সঙ্গে স্বদেশি ও আন্তর্জাতিক হওয়া। নিজের জাতিসত্তার ও সংস্কৃতির প্রতি অবিচল থেকে আন্তর্জাতিক হওয়া। আজকের পৃথিবীতে

কোন দেশ-জাতি নির্জন দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আজ তাকে নিজের মাটিতে আপন ঐতি হ্যর শেকড় গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত করে দাঁড়াতে হবে। নজরুলের মতো বলতে হবে, “বল বীর/ বল উন্নত মম শির/ শির নেহারি আমারি নতশির ওই শির হিমাদ্রির।”

এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় যদি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলেই মানুষ স্বাধীন চিত্ত সত্বার জাগরণ ঘটাতে পারবে। পরাধীন যুগের স্বাধীন কবি নজরুল বারবার স্বদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিত্ততার জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি প্রথমে মনের শিকল ভেঙে পরে হাতের শিকল ভাঙ্গার কথা ব লছেন। নজরুলের ভাষায়, “মনের শিকল ভেঙ্গেছি, এবার হাতের শিকলে পড়েছে টান।”

বাংলার মানুষের বীরোচিত সংগ্রাম আর বিজয় গাঁথা আজও সঠিকভাবে রচিত হয়নি বরং বারবার বিকৃত হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন নজরুলের মতো অকুতোভয় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কবি সাহিত্যিক, যিনি বাংলার সাহসী সন্তানদের সংগ্রামকে সাহিত্যে তুলে আনবেন, এ দেশের দুঃখী মানুষকে সাহসও প্রেরণা জোগাবেন মানবতার জয়ের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাতে মানুষ আশাহত না হয়ে, উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

নজরুল যেমন তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্যদিয়ে বিশ শতকের প্রথম চার দশকের পরাধীন দেশের মানুষের মর্মজ্বালাকে ছন্দে গানে তুলে ধরে ভীতি তুচ্ছ করে উপনিবেশিবাদ, সামান্তবাদ এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশে তেমন কবি সবচেয়ে বেশি দরকার। মানুষ আজ হতাশ এবং বিভ্রান্ত। এই অবস্থা থেকে প্ররিত্রানের পথ প্রদর্শন করতে পারেন নজরুলের মতো মানবতাবাদী এবং সংগ্রামী শিল্পী-সাহিত্যিক; যিনি আন্তর্জাতিক স্বার্থের রক্ষক দেশীয় তাঁবেদারদের মুখোশ উম্মোচন করতে পারেন নির্ভয়ে, নিসঙ্কোচে। নজরুল পরাধীন দেশের মানুষকে অগ্রযাত্রার পথপ্রদর্শনের জন্য নজরুলের মতো নির্ভয় মানুষের প্রয়োজন, যিনি সত্য কথা বলতে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতিকে বিবেচনায় আনবেন না।

ভারতের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা শহরের অনতি দূরে হাজীপুর গ্রামে ছিল আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ব-পুরুষদের আদিবাস । মোঘল আমল থেকেই কবির পূর্ব-পুরুষরা কাজী বা বিচারকের দায়িত্ব পালন কওে আসছিলেন বলে তার বংশটি কাজী বংশ নামে খ্যাত । ১৭৫৭ এর চক্রান্তোত্তর

কালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ-দৌলার প্রধান সিপাহশালার মীর জাফর আলী খাঁ অতি অল্প সময়ের জন্য নবাবী শিরস্ত্রান মস্তকে ধারন করেছিলেন । অতঃপর তার জামাতা স্বাধীন চেতা নবাব মীর কাশিম মসনদে সমাসীন হন । অচিরেই নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে বেনিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধারদের স্বার্থ-সংঘাত ও মনো-মালিন্য চরম আকার ধারন কওে । এ সুযোগে উড়িষ্যার ফৌজদার এলিস অতর্কিতে পাটনা আক্রমন করে শহরটি দখল করে নেয় এবং উপর্যুপরি কয়েকদিন হত্যা ও লুটতরঙ্গ চালায় । ঐ হত্যা, লুন্ঠন ও ধ্বংসের একমাত্র শিকার হয়েছিল ধনী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা ।

এতে পাটনার দেওয়নী, ফৌজদারী ও নিজামতের পদস্থ লোকেরা সম্পূর্ণ ভাবে নাজেহাল হলেন । তদুপরি ইংরেজ সৈন্যদেও উদ্দেশ্যমূলক নির্যাতন, হয়রানি ও তাড়া খেয়ে বাস্তুভিটা ছেড়ে অনেক মুসলমান পরিবার ফেরারি হয়ে যায় । এমনি দুর্দিনে নজরুলের পূর্বপুরুষেরা পার্শ্ববর্তী বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করেন । চরুলিয়ার অশ্রয়হীন দারিদ্র পীড়িত কাজী পরিবারের আভিজাত্য বোধহয় আর অবশিষ্ট রইলনা । পরিচয় আত্নগোপন কওে চুরুলিয়ার জামে মসজিদে ইমামতি ও মক্তবে শিক্ষকতা করে এবং গ্রামের মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভও করে অতিশয় দুঃখ কষ্টে পরিবারটি দিনাতিপাত করতে থাকে । চুরুলিয়ার এই কাজী পরিবাওে ১৮৯৯ ইং সনের পচিঁশে মে ঐক্যে বঙ্গাব্দের ১৩০৬ এর এগার ই জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহন করেন । পর পর চারটি সন্তানের মৃত্যুও পরে সংসারে এলেন নজরুল । তাই ব্যথাতুরা মা হাযেরা খাতুন বড় দুঃখের সন্তানটির নাম রাখেন দুখু মিঞা, এ আশায় যে হয়তোবা এ সন্তানটির অকাল মৃত্যু হবেনা ।

শৈশবেই নজরলের মাঝে বিরল প্রতিভার আলামত প্রতিভাত হতে থাকে । গাঁয়ের মক্তবে পড়াশুনা শুরু কওে মুসলিম শাস্ত্রে পারদর্শী চাচা কামিল করিমের কাছে নজরুল আরবী এবং ফার্সি ভাষা শিখতে থাকেন । কাজী পরিবারের নিত্যদিনকার ব্যবহৃত ভাষা ছিল ফার্সি ও উর্দ্দু । তাই পরবর্তীতে নজরুলের লেখায় আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দু শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । পারিবারিক ঐতিহ্যের কারনেই আজিবন দারিদ্রের সঙ্গে পানুতা লড়ে এবং আরুষ্ঠানিক কোন বিশেষ কোন পড়াশুনা না করেও অসাধারন প্রতিভাধর ধার্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এক অভিনব ধারার প্রবর্তন করেন ।

শৈশব কাল থেকেই নজরুল অতিসুন্দর ভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন । আবৃত্তির কণ্ঠ ছিল তার অতি সুমধুর । উস্তাদের গড় হাজিরাতে মক্তবের পড়ুয়াদের কোরআন শিক্ষা দিতেন এবং মসজিদে ইমামতি করতেন কিশোর নজরুল । নজরুলের আটবৎসর বয়ক্রম কালে তার আব্বা কাজী ফকির আহমেদ মৃত্যুবরণ করেন । এতে সংসারে দারুন অভাব অনটন দেখা দেয় । বড়ভাই সাহেবজানের একক প্রচেষ্ঠায় মা-ভাই-বোনদের দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান হচ্ছেনা দেখে নজরুল পড়াশুনায় ইস্তফাদান করেন । এরপর থেকে শুরু হয় তার খাপছাড়া লাগামহীন জীবন । মক্তবে শিক্ষকতা, দরগাহে খাদেমগিরি, কখনোবা গ্রামের মোলøা, মসজিদে ইমামতি, খৃষ্টান গার্ড সাহেবের বাসায় বাবুর্চিগীরি এবং আরো ছোট খাট এটা উটা ।

১৯১০ সালে নজরুল বাসুদেবের লেটুরদলে যোগদান করেন ।গ্রামীন সংস্কৃতির অন্যতম ক্ষেত্র লেটুর দলে সমপৃক্ততায় কৈশোরে নজরুলের প্রতিভার উম্মেষ ঘটে । ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত লেটুর দলে জড়িত থেকে নজরুল হিন্দু মুসলিম পৌরানিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা-ভিত্তিক ‘দাতাকর্ণ’, ‘মেঘনাদবধ’, ‘কবি কালিদাস’, ‘আকবর বাদশাহ’, ‘চাষার ঢং’, প্রভৃতি পালাগান সহ এগারটি নাট্য রচনা করেন এবং তাতে অভিনয় করে অতি অল্প সময়ে ‘উস্তাদ; খ্যাতি অর্জন করেন । ভোর হল দোর খুলো; ‘আমি হবো সকাল বেলার পাখি’ ও কুমিলøার বীরেন সেন গুপ্তের বাড়ীর পেয়ারা গাছের কাঠবিড়ালির সঙ্গে ছোট মেয়ের ভাব জমানো কথাসম্বলিত ‘খুকী ও কাঠ-বিড়ালি’, খাদু-দাদু’, ‘লিচুচোর’, ‘ছোট হিটলার’, ‘নতুন খাবার’, ‘প্রজাপতি প্রজাপতি’, ‘শিশু যাদুকর’, ‘সারস পাখির মা’, ‘অমর কানন’ প্রভৃতি কৈশোরের অনবদ্ধ শিশুতোষ হাসির ছড়া-কবিতা, গণিত শিক্ষামূলক কবিতার মধ্য দিয়ে নজরুল বাংলা সাহিত্যে সাড়ম্বরে প্রবেশ করেন ।

সর্বোপরি দুঃখই ছিলো নজরুলের চির সঙ্গী । দারিদ্র্যেও কশাঘাত সহ্য হলনা দুখুমিঞাার । পুনরায় চলে গেলেন আসানসোলের ধামমুখর কোলিয়ারী গুলিতে সামান্য কাজের সন্ধানে । এত ছোট ছেলেকে কে চাকুরি দেবে ? অনেক চেষ্টা তদবির করে এম, বকমের রুটির দোকানে নাম মাত্র বেতনে একটি কাজের ব্যবস্থা করে নিলেন । দিনভর রুটির দোকানে হাড়ভাঙ্গা মেহনত করে রাত্রিতে চিলে কোঠায় বসে পুঁথি পড়তেন আর গান লিখতেন নজরুল । আসানসোল থানার সাব ইনসপেক্টর কাজী রফিজুলøাহর সঙ্গে দৈবচক্রে নজরুলের একদিন সাক্ষাত হয়ে গেল নজরুলের একদিন । কাজী সফিজুলøাহ নজরুলের মধ্যে প্রভূত সম্ভাবনার অস্তিত্বের টের পেয়ে তাকে নিয়ে এলেন নিজ গ্রাম ময়মনসিং এর ত্রিশালে । ১৯১৪ সনে নজরুলকে দরিরামপুর হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি করিয়ে দিলেন । কবির বাল্য বিদ্যাপীঠ এই মরিরামপুর হাই স্কুল হালে নজরুল একাডেমী নামে পরিচিত এবং এখানেই সম্প্রতি সরকারী ও বেসরকারী ভাবে নজরুল বার্ষিকী উদ্‌জাপিত হয়ে আসছে । দরিরামপুরে সপ্তম শ্রেনীর পাঠ সম্পন্ন করে নজরুল পুনরায় চলে এলেন বর্ধমানে । জ্যৈষ্ঠ্যের ঝড় নিয়ে ধরাধামে এসেছিলেন তিনি । স্বভাবে তেমন দুরন্ত-দুর্বার-চঞ্চল, দুরন্তপনার কোন চৌহদ্দী না থাকলেও শিক্ষকের তিনি ছিলেন নয়নের মনি । বাঁধন হারা নজরুল সুরে-গানে মাতোয়ারা থাকলেও স্কুলে ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র । খুব ছোট বেলায় অভাবের সংসারে হাল ধরতে হয় বলে, স্কুল-কলেজের প্রথাগত পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে পারেননি নজরুল ।একাধিক স্কুলে ভর্তি হয়েছেন, তাই ক্লাশে পাশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি । তবু মনি মুক্তা অন্ধকারেও জ্বলে । ১৯১৫ সনে রানী গন্জে রহাই স্কুলে ভর্তি হলেন অষ্টম শ্রেণীতে । এ সময়টাতে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দেও সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠে তার । দুই বন্ধুতে মিলে শুরু হয় কিশোর সাহিত্য চর্চা । নজরুল ’চড়ুই পাখির ছানা’, ’রাজার গড়’, রানীর গড়, প্রভৃতি ছড়া কবিতা রচনা করেন ।

দশম মানের শেষ পর্যায়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমনি সময়ে প্রথম মতযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) দামামা বেজে উঠে । নজরুল ৪২ নং বাঙ্গালী পøাটুন ভুক্ত হয়ে চলে যান আরব সাগরতীরস্থ করাচী সেনানিবাসে । সেখানে একজন পাঞ্জাবী মৌলভীর সাহচর্যে থেকে আরবী ও ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করতে থাকেন । এসময় তিনি অনুবাদ করেন পারস্য কবি হাফিজ ও রুমীর কিছু কিছু কবিতা । যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীর

কঠোর নিয়ম রীতির ফরমাবরদারি করেও নজরুল করচী সেনানিবাসে থেকে নিজস্ব রীতিতে 'বাউন্ডেলের আত্নকাহিনী' রচনা করেন । তাছাড়া লিখেন আরো অনেক কবিতা, গল্প ও গান ; আর এগুলোকে পাঠাতেন কলকাতায় ছাপার জন্য । কলকাতার সওগাত পত্রিকায় নজরুলের ছোট গল্প বাউন্ডেলের আত্নকাহিনী প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সনে । এরপর প্রকাশিত হয় তার মুক্তি বা ক্ষমা কবিতা । এতে খুব নাম হল তার । ক্রমে খ্যাতির সীমা ছড়িয়ে পড়তে থাকে । জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় । এমনি করে নজরুল বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন ।

মুসলিম প্রধান এ বাংলাদেশে হিন্দু- মুসলিম্ু বৌদ্ধ- খৃষ্টান মিলে যে জাতীয় মানস গড়ে উঠেছে, তার পকৃত রুপকার কবি নজরুল ইসলাম । কারন নজরুলের আগমনের পূর্বে বাংলা সাহিত্য কুঞ্জে মুসলিম পদচারনা ছিল অতিমাত্রায় সীমিত একভীরু । '১৭৫৭ তে পলাশী বিপর্যয়', ১৭৯৩-তে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি বিলোপ, ১৮২৮ এর বাজেয়াপ্ত আইনে নিস্কও সম্পত্তির রায়তি স্বত্নলোপ, ১৮৩৭ এ ফাস্রি্র রাজভাষাচ্যুতি ও ইংরেজী ভাষার অধিষ্ঠান এবং ১৮৫৭ তে সর্ব ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা বিপøব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে, বিদেশী ঔপনিবেশিক বেনিয়া ইংরেজদেও অত্যাচার, অপঘাত, নির্যাতন ও শোষনে এ যাবৎ কালের রাজদন্ড ধারী মুসলমানরা রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে একটি নিঃস্ব, অধঃপতিত, নিষ্ক্রীয় ও জীবম্মৃত জাতিতে পরিনত হয় । অবিভক্ত বাংলার জনগোষ্ঠীর শতকরা ছাপ্পান্ন জন মুসলিম হয়েও নির্দিষ্ট পরিমানের বিষয় সম্পত্তি ও নির্দিষ্ট মানের শিক্ষা না থাকার কারনে মুসলমানরা কোয়ালিফাইড ভোটার হতে পারেনি । ইংরেজ আশীর্বাদ পুষ্ট সংখ্যালঘু হিন্দুরা বাংলার আইন সভা থেকে শুরু করে শিক্ষাদীক্ষা, ব্যাবসা বানিজ্য ও চাকুরি ক্ষেত্রে একচেটিয়া সুযোগ ও অধিকার লাভ করে । মুসলমানদের শতাব্দী লালিত আরবী-ফার্সি-উর্দ্দু-তুর্কী শব্দ সম্ভার মিশ্রিত ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির কণ্ঠ রোধ করে একটি ঘনকালো যবনিকা টেনে দেওয়া হয় । ব্রিটিশ বংগীয় রাজধানী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) এর লর্ড ম্যাকলে, মার্শম্যান ও পাদ্রী ক্যারী সাহেবদেও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা অনুকূল্য এবং নির্দ্দেশনায় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতেরা আরবী্ু ফার্সি-উর্দ্দু বর্জিত তদ্ভব শব্দ কন্টকিত সম্প্রদায়গত একটি সাহিত্য ধারা সৃষ্টি কওে বাংলাভাষার রেনেসাঁর সূচনা করে। ছয়শত বৎসর ব্যাপী যে বিদেশী মুসলমানরা ভারতবর্ষে্র একটি একক মানচিত্র তৈরী করে এদেশীয় হয়ে এদেশ শাসন করেন এবং যে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য সাড়ে ছয়শত বৎসরের অধিক কাল এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মনের খোরাক যুগিয়েছিল, সে মধ্যযুগীয় ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান স্বীকৃতি পেলোনা এসম্প্রদায়গত সাহিত্যে এবং তাতে অনুলেøখ্য রয়ে গেলো মুসলিম জীবন ও কবি সাহিত্যিকরা । হিন্দু মুসলিম মিলে যে বাঙ্গালি জাতি, তার সামগ্রিক আশা আকাংখা, উৎসাহ উদ্দীপনা চেতনা এ সাহিত্যে ছায়াপাত করলোনা । পশ্চিম বঙ্গীয় অধ্যাপক নারায়ন চট্টোপাধ্যায় বলেন বাংলা ভাষা থেকে আরবী ফার্সি শব্দ সম্ভার সরিয়ে মুসলমান প্রভাব বর্জন করতে গিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও স্বাভাবিক গতিপথ ব্যাহত কওে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিও পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে ।

বেনিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশীয় দু-ভাষী বানিজ্যিক প্রতিনিধি, মুৎসুদ্দি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী কৃতি ব্যক্তিরা যারাছিল ভারত বর্ষে ইংরেজ শক্তি ও স্বাথে্র প্রথম ও প্রধান অবলম্বন নিজেদেও পারিবারিক ভিত

প্রতিষ্ঠার জন্য ভাগীরথি নদীর তীরবর্তী ফিরিদিপাড়া, গোবিন্দপুর, সুতানুটি, চিৎপুর, কলকাতা প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে ১৬৯০ সালে জবচানক ও ইংরেজ সৈনিক-নাবিকদেও কেন্দ্র কওে আজকের জ্বলজ্বলে কলকাতা গড়েছিল, সেই স্যাঁৎসেঁতে জঙ্গলোকীর্ণ গ্রাম গুলো নিয়ে গড়ে উঠা কলকাতা ক্রমে সমগ্র সুবাহ বাঙ্গালাহ তথা প্রাচ্যের সমৃদ্ধশালী ও মুসলিম ঐতিহ্য মন্ডিত রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের স্থান দখল করে নেয়। বেনিয়া শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের প্রভূত্বের পরাক্রমকে ক্ষোভে দুঃখে ও অব্যক্ত বেদনায় মুহ্যমান নিঃস্ব-রিক্ত মুসলমানরা মেনে নিতে পারেনি। উপরন্তু বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে মুসলিম জাহানের আশা আকাংখা ও ঐক্য এককেন্দ্রিকতার প্রতীক তুর্কী সালতানাত (১২৯৯-১৯২২) ইউরোপের 'রুগ্নব্যক্তি' সাব্যস্থ করে ভেঙ্গে ফেলার গোপন অশুভ পাঁয়তারাতে ভারতব্যপী অবদমিত মুসলমানরা আতঙ্কে নিমজ্জিত হয় এবং তারই প্রতিবাদে ভারতময় 'খেলাফত আন্দোলনের' সুত্রপাত ঘটে। এমনি সময়ে ১৯২০ সনের প্রারম্ভে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়া হলো। পরনে হাবিলদারের পোশাক, পেশীতে সৈনিকসুলভ দৃঢ়বদ্ধতা,বুকে অসীম সাহস ও চোখে যেবিনের অমিত চাঞ্চল্য নিয়ে সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি ১৯১১' অফিসে এসে উঠেন। বাংলার বীরত্ব তার বাহুতে টগ-বগ, আর দেশ প্রেমে তিনি তখন বাধনহারা। 'তুই নির্ভও কর আপনার বার, আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর' এ সংকল্প নিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন ।এক্ষেত্রে কবি কাজী সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন লব্দ-প্রতিষ্ঠ সম্পাদক কবি মোজাম্মেল হকের । সাম্যবাদী নেতা কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ (সন্দ্বীপ) ও নজরুলকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রদান কওে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেন। তাই বাংলা ভাষার সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী কবিতার অগ্রদূত হলেন কবি নজরুল ইসলাম।

মুসলেম ভারত, সওগাত, কলেøাল, নবযুগ, কালি-কলম, লাইল, ধুমকেতু পভৃতি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংশিøষ্টতা ইংরেজ জিঞ্জিরে শৃংখলিত বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূচনা করে। নজরুলের বিপøবাত্মক, বীরত্ব ব্যঞ্জক সঙ্গীত, পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গা ও জাগরন মূলক গান, কবিতা, কথা-সাহিত্য, সম্পাদকীয় এবং ভাষন ও অভিভাষনের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরুধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন (১৯২০-২২) এ আলোড়িত ও সীমাহীন অসন্তোষ প্রজ্জ্বলিত গন-মানস কে জাগিয়ে তুলেন। তার সাহিত্য কর্মে, নতুন ভাব-ভঙ্গি, অভিনব ভাব-বস্তু, নির্মল উচ্ছাস এবং মুক্তজীবনের স্বাদ ও স্বাধীনতা মন্ত্রেও উত্তপ্ত পরশ পেয়ে সমকালীন জনগোষ্ঠী অকুণ্ঠিতভাবে নজরুলকে বরন করে নেয়। বাংলার আকাশ-বাতাস ও বাঙ্গালীর মন-প্রাণ মাতাল করে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতো উদিত হলেন নজরুল ।তার মাঝে তারা সংগ্রামের অগ্রপথিক ও উদগ্র প্রেরনা খোজে পেলো, যা তাদেও হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরনিত করলো এক নতুন ঝংকারের। সমগ্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো- 'দুর্গমগিরি কান্তারও যাত্রীরা হুঁশিয়ার'। তাইতো ১৯২৯ সনের ১৫ইং ডিসেম্বওে কলকাতার আলবার্ট হলে নজরুল সংবর্ধনায় সভায় বরেণ্য বিজ্ঞানী স্যার আচার্য প্রফুলø চন্দ্র রায় সভাপতির ভাষনে বলেন, 'আমরা আগামী সংগ্রামে নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারন করিয়া সুভাষ চন্দ্র বসুর মত তরুন নেতাদের অনুসরন করিব'। ফলে এ যাবত কালের 'মরিতে চাহিনা এ সুন্দর ভূবন্ধে। জয় হোক, জয় হোক ব্রিটিশের জয়ও-ব্রিটিশ রাজ্য লক্ষী যেন স্থির রয়' প্রভৃতি ঘুম পাড়ানি গানের মোহাচ্ছন্নতা ও 'জন-গন

মনের অধিনায়ক' ব্রিটিশের তোষন নীতি প্রত্যাখ্যান কওে উতলা ধরনীর অশান্ত মানুষের অযুত কণ্ঠে নজরুলের সঙ্গে গেয়ে উঠলো 'বল বীর! বল উন্নত মম শির৩'। হাতে গুনা কিছু রক্ষনশীল প্রবীনের আশীর্বাদ না পেলেও দেশবন্ধু, বিপনপাল, সুভাষচন্দ্র, আচার্য প্রফুলø চন্দ্র সহ যুব মনের ভালবাসা ও বুকের মালা পেয়েছিলেন নজরুল। বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগল- 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর৩প্রলয় নূতন শৃংখল বেদন৩'। 'আমি বেদুঈন' আমি চেঙ্গিস, আমি আপনার ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ৩। কান্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর, বাঙ্গালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর; ঐ গঙ্গায় ডুবিছে ভারতের দিবাকর, উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্বার৩-।

বাল্য-কৈশোওে দুঃসহ দারিদ্র্য পীড়িত একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন কবি তার বিপøবী লেখনি দ্বারা ব্রিটিশ রাজের ভারতীয় ভিত কাঁপিয়ে তুলেন। ব্রিটিশ শাসনকে স্রষ্টার আশীর্বাদ গন্য কওে সম-কালীন কবি-সাহিত্যিকরা যখন নীরব দর্শক, সে সময় নজরুলের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত দেশ-প্রেমও স্বদেশ চেতনামূলক উন্মাদনা জাতির হৃদয়বীনায় ঝংকৃত করলো এক নূতন সুর এবং ঘুমন্ত জাতিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কওে বললো 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু৩যাত্রীরা হুঁশিয়ার৩'। 'ঈশান ! বাজা তোর প্রলয় বিষান ধ্বংস নিশান উঠোক প্রাচীর, প্রাচীর ভেদী'৩। বিদ্রোহের সুর তুলে, ভাঙ্গার গান গেয়ে অশিক্ষিত, অর্ধচেতন জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে ঝড় তুলেছিলেন বলেই তো ১৯২৯ সনের ১৫ইং ডিসেম্বর নজরুল সম্বর্ধনা সভার বিশেষ অতিথি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন 'কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙ্গালি জাতির' । ৩তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারন, তার গান পড়ে, আমার মতো বেরসিক লোকের জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হতো। আমাদেও প্রাণ নেই, তাই আমরা এমনি প্রাণময় কবিতা লিখতে পারিনি। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘওে বেড়াই ।প্রাদেশীক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নজরুলের 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' এর মতো প্রাণ মাতানো গান কোথাও শনেছি বলে মনে হয় না৩।

নজরুল অক্ষয় কীর্তি 'অগ্নিবীনা' ও প্রথম প্রবন্ধের বই 'যুগবানী' প্রকাশ করেন বিশের দশকে (১৯২২)। অগ্নিবীনার বারটি কবিতার একটি-ই সুর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা । নজরুলের অসাধারন জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী' ১৯২২ সনের ৬ই জানুয়ারী- ঐক্যে ১৩২৮ এর ১২ই পৌষ সাপ্তাহিক 'বিজলি'তে ছাপাহলে তার সব কটি সংখাই বিক্রি হয়ে যায়।এবং ঐ সংখ্যাটির পুনঃমুদ্রন দিয়ে আজ থেকে প্রায় পৌনে একশত বৎসর পূর্বে একটি মাত্র কবিতার জন্য পত্রিকাটির ঊনত্রিশ হাজার কপি নিঃশেষে বিক্রি হয়ে যায় । 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে রাতারাতি বিপøব সৃষ্টি কওে বিশ্বেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ জন নন্দিত কবির মর্যাদায় অভীষিক্ত হলেন নজরুল। সম্ভাষন জানিয়ে রবীঠাকুর নজরুলকে আশীর্বাদ বাণী প্রেরন কওে বলেন 'বিপøবী বাংলার গৌরব তুমি, সারাদেশ তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। তুমি অনেক বড় হবে; তোমার এ কবিতা সমগ্র জাতির জীবনে জাগরন নিয়ে এল৩-'। বিদ্রোহী কবিতার বিপুল জনপ্রিয়তা দল, মত -গোষ্ঠী নির্বিশেষে নজরুলকে সম্বর্ধিত করেছিল। ইংরেজ মাহেবরা অবহিত হয়েছিলেন 'হি ইজ অওয়ার গ্রেটেষ্ট পোয়েট নেক্স্‌ট টু রবীন্দ্রনাথ' ।গ্রীককবি হোমারের 'ইলিয়াড' বাল্মীকির 'রামায়ন' এবং ব্যাসের 'মহাভারত' রচনায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে সমকালীন মানুষের সংগ্রামশীল চেতনা এবং চারটি মহাকাব্যই

যুদ্ধাবস্থাকালীন মহান সাহিত্য। নজরুল ও তাঁর 'বদ্রোহী' কবিতার সমকালীন প্রপীড়িত মানব-চেতনা ও মানব মুক্তির ভাবনায় উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে সার্থক কাব্য রচনা কওে বিদ্রোহী কবি আখ্যায় ভূষিত হন। সমকালীন মেজাজ ও চাহিদাকে কবি যথাযথভাবে উপলব্দি কাব্যে রুপদান করেন। যুগের মনকে যা প্রতিফলিত কওে, তা শুধু কাব্যই নয়, মহাকাব্য। তাই বিদ্রোহী একটি মহা কাব্য এবং তার রচয়িতা কবি কাজী নজরুল ইসলাম একজন মহাকবি। 'বিদ্রোহী' কবিতার পুর্নাঙ্গ আলোচনা করতে গেলে সমালোচককে 'গোলটেবিল কনফারেন্স', সাইমন কমিশন, 'বেলাল, জগলুল পাশাকে জানতে হবে। আন্তর্জাতিক ইতিহাসের সম্যক ধারনা নিতে হবে; 'ভৃগু'ও 'অর্ফিয়াস' তাবে নিয়ে যাবে হিন্দু ও গ্রীক পুরানের দিকে; টর্নেডো, টর্পেডো কি তাজানতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে। তবেই বুঝা যাবে নন্দিত হয়েও 'মহাপদ্য কার' বলে নিন্দিত কবির জ্ঞানের চৌহদ্দী কত বড় !

চলতি শতাব্দীর বিশের দশক ছিল নজরুলের কবিতা লেখার সুবর্ণ সময়। এ দশকে তার প্রকাশিত গ্রন্থসংখাও প্রচুর- যেমন, অগ্নবীনা (১৯২২), দোলন চাঁপা (১৯২৩), ভাঙ্গার গান (১৯২৪), ছায়নট (১৯২৪), ঝিঙ্গেফুল (১৯২৪), চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা, সাম্যবাদী (১৯২৬), ফনি মনসা (১৯২৭), সিন্দু হিন্দুল (১৯২৯), জিঞ্জিতর (১৯২৮), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), বিষের বাঁশি, চক্রবাক, প্রলয় শিখা, হাফিজ, নতুন চাঁদ, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, পভৃতি কাব্যগ্রন্থ ; ব্যাথার দান, রিক্তের বেদন, পভৃতি গল্পগ্রন্থ; মৃত্যুক্ষুধা, বাধনহারা, কুহেলিকা প্রভৃতি উপন্যাস; আলেয়ার ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, পুতুলের বিয়ে, প্রভৃতি নাটক; সাত ভাই চম্পা, পিলেপটকা পুতুলের বিয়ে, লিচুচোর, কাঠবিড়ালী, ঘুম-পাড়ানি পাখি, ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি প্রভৃতি শিশুতোষ হাসির কবিতা ও গান। ফলে বিংশ শতাব্দির বিশের দশক ছিল কবি কাজীর প্রতাপের কাল। কবি ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-চিত্রকল্পে, ব্যঞ্জনায়, পুরাণ ও কোরআন প্রয়োদে বাংলার প্রচলিত ছক ভেঙ্গে নতুন ধারার সৃষ্টি করেন।

এ সময়টিও আবার ছিল রবী ঠাকুরের প্রতিভাও দীপ্তির সময়। রবী ঠাকুরের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা তখন মধ্যদিনের সূর্যেও ন্যায় বাঙ্গালির কাব্য সাহিত্যে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার কওে রেখে সমগ্র সাহিত্যিক চেতনা এবং সাহিত্যিক মনকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত কওে রেখেছিল । রবী ঠাকুর তখন বাংলা সাহিত্যে একক বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। রবীন্দ্র যুগের সেই উব্বর মুহূর্তে নজরুল নিজ পরিমন্ডলে আবির্ভূত হন। রবী ঠাকুরের পওে কবি কাজী নজরুল ইসলামই হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যেও সবচেয়ে প্রতিভাধর প্রথম মৌলিক কবি। রবী ঠাকুর বাংলা সাহিত্যেও অমূল্য সম্পদ হিসাবে নিজের স্থায়ী আসন গড়ে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা তিনি অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তি বেচে থাকে তাঁর কর্মে । রবী ঠাকুর সাহিত্য চেতনার আলোকে বেঁচে আছেন। নজরুল ও একজন শক্তিমান কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, উপন্যাসিক, অভিনেতা ও নাট্যকার। তিনি প্রচন্ডভাবে ঐতিহ্য প্রিয় লেখক ও উঁচুমানের বাগ্মী। তাঁর ঐতিহ্য-চেতনা, রবী ঠাকুরের বিপরীতে একটি শক্তিশালী সাহিত্য চেতনার প্রতিষ্ঠা করলেও নজরুলের উত্তরসুরীগন তাঁর সাহিত্যেও আলোচনায় এবং মূল্যায়নে নজরুলকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হননি। নজরুলের সাহিত্য মূল্য প্রতিষ্ঠালাভ করলে তাঁর ঐতিহ্য-চেতনার নব আলোক প্রাপ্ত মুসলিম বাঙ্গালি যুব সমাজ উজ্জীবিত হতো এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে পারতো। রবী ঠাকুর ও নজরুল দুজনই বাংলার কবি, বাংলা সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

কবি। দুয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। কাউকে বর্জন করে নয়। যগের চাহিদা ও প্রয়োজনের নিড়িখে নজরুল কাব্য-চেতনার নব আলোকে বাঙ্গালি যুব সমাজকে নতুন পথের সঠিক দিশা দিতে হবে।

নজরুল ছিলেন অবিরাম সৃষ্টিশীল। প্রথম মহাযুদ্ধাবসানে জীবন যুদ্ধে জড়িত নজরুল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিড়ম্বনা ও ভর্ৎসনার কুটজালে আটকে পড়লেও তাঁর সৃষ্টির আনন্দ ছিল অসীম। ভুদেব, হেমচন্দ্র, নবীন, যতীন, বঙ্গলাল, মোহিত লাল, মধুসুদন, শরৎ, বঙ্কিম, অমিয়, জীবনানন্দ ও সুকান্ত চক্রবর্তীঁরা যখন রবীন্দ্র বলয়ে আবর্তিত হয়ে হিন্দু বিষয় বস্তুকে তাদের কাব্যকৃতির উপজীব্য করে সাহিত্য রচনায় বিভোর, নজরুল সে মূহুর্তে তার ধুমকেতু জ্বালা ও বিদেশী শাসনের শিকল ভাঙ্গার রণসঙ্গীত গেয়ে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের কেলøায় বিজয় কেতন উড়িয়ে দিলেন। তাই ব্রিটিশের অন্তিম যৌবনকালে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা রীতিমতো বিস্ময়কর। যুদ্ধ শেষে তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। অন্যান্য অপসৃয়মার কবি সাহিত্যিকদের মতো রবীন্দ্র স্তুতিতে লিপ্ত হননি নজরুল। রবী ঠাকুরের সমকালে (১৮৭৯-১৯৪১) জন্মেও নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) স্বতন্ত্র্যেও অধিকারী। রবী ঠাকুরের দুর্দন্ড প্রতাপ সাহিত্যাকাশের চতুর্দিক উদভাসিত করে রাখলেও নজরুলের ভাষা প্রকাশভঙ্গীও কাব্যরীতি সম্পূর্ণ পৃথক পথে অভিব্যক্ত হলো। তার কাব্যে, গানে, কবিতায় কোথাও রবী ঠাকুরের ছায়াপাত ঘটেনি। অধিকন্তু, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) পৌরহিত্যে রচিত মহাভারতীয় সহিত্যে অবোধ্য ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত বহুলতার যে আড়ষ্টতা মুস্øম কবি-সাহিত্যিকদের সম্মুখে এতকাল প্রতিবন্ধকতার একটি দুর্লংঘ্য প্রাচীর গাড় করিয়ে রেখেছিল, নজরুল নির্দ্বিধায় তা ঝেড়ে ফেলেদিলেন। আর্য-সাংস্কৃতিক যুগটা বাংলাভাষী মুসলমানের জন্যে ছিল একটা মহাসংকটের সময়। আর্য সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর যুগে দুর্দশাগ্রস্থ ব্ংলাভাষী মুসলমানদের সমস্ত শংকা ও হীনমন্যতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে 'লা শরীক আলøাহর' তৌহিদের বাণী বাংলাভাষার শিরা-উপশিরা-অস্থি-মজ্জায় বেমালুম প্রবাহিত করে দিলেন নজরুল।

আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দভাষায় মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা সকলদেশের মুসলমানদের অবহিত হওয়া কর্তব্য। অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য যে কোন জাতির মারস চেতনার একটি অতি মজবুত ভিত্তি, যার উপর দাড়িয়ে ভবিষ্যত স্বপ্ন নির্মাণ করা যায়। তাই যে আরবি ফার্সি শব্দ সম্ভার একদা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে বর্জিত হয়েছিল, সে ভাষার সাহিত্যিক প্রয়োগ করে নজরুল নতুন ভাষা সৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য-তাহজীব-তমদ্দুন ও ইসলামী বীরত্ব গাঁথাকে সাহিত্যে রূপদান করে গেয়ে উঠলেন 'লাল শিয়া অসিমান, লালে লাল দুনিয়া, আম্মা, লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া' 'কান্ডারী ! এতরীর পাকা মাঝি-মালøা, দাড়িমুখে সারি গান লা শরীক আলøাহ'' ''দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল ; ওরে বেখবর ! তুই ও উঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল'' । তৌফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম জাহা পুনঃ হোক আবাদ। দাও সে সালাহ দ্বীন, পাপ দুনিয়ায় ফের চলুক জেহাদ। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম ধারা ও নব সাহিত্য চেতনা সূচিত হওয়ার ফলে বাংলাভাষী মুসলমানদের ভাষা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হয়ে উঠে, যার কারনে ১৯৪৭ এ পশ্চিম বঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলাম আমরা।

হামদ, নাত, কাওয়ালী, ভাটিয়ালী, মারফতি, মুর্শিদী, জারি, সারি, গান-গজল ও কবিতার সার্বজনীন আবেদনের জন্য নজরুল শুধু মুসলমানের নিকটই ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন্নি; বঞ্চিত ও নির্যাতিতের পক্ষে এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার লেখনি তাকে বাড়তি জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। বর্তমান শতাব্দির বিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে নজরুলের কাব্যে ভারতীয় জন-মানসের অস্থিরতা ও মুক্তির আকুলতা চিত্রিত হয়ে উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধেও পর হতে ১৯৪২ সনের ৯ই আগষ্টে নির্বাক হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক রচনা, অন্যের নাটকে সঙ্গীত রচনা, সুর সৃষ্টি, বক্তৃতা, মঞ্চও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নজরুল শুধুমাত্র বাংলার শিল্প রসিক ও সাহিত্য মোদীদের হৃদয়ই জয় করেননি; বিদ্রোহের সুর তুলে, ভাষার গান গেয়ে পদতলের উতলা ধরনীর অশান্ত-অবদমিত জনগোষ্ঠীর মানস পটে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ ও বঞ্চিতের মাঝে অনিবার্য কওে তুলেছিলেন নিজের অস্তিত্বকে। পরম স্নেহে শ্রদ্ধায় ও সমাদরে গ্রহনীয় করে তুলেছিলেন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে নিজেকে।

বাল্য ও কৈশোরে রবী ঠাকুরের জীবন যাপন ছিল অপরিমিত পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসা, বিত্ত সাচ্ছল্য এবং প্রভুত শিক্ষা সুবিধাদি ঘেরা। তাই অঢেল বিত্ত বৈভব ও মান মর্যাদার অধিকারী রবী ঠাকুর সামাজিক জীবনে ছিলেন সুখী ও অতি মাত্রায় তৃপ্ত। তিনি প্রবলভাবে বেঁচেছিলেন। কার্যত ঃ বাল্য ও কৈশোরে নজরুল ছিলেন পুরোপুরিভাবে স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত ও অভিভাবকহীন। রবী ঠাকুরের জৌলুস পূর্ণ প্রলম্বিত জমিদারি জীবনের বিশাল বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কাব্যকৃতির মজবুত পটভূমি সহায়-সম্বল হীন রাজনৈতিক উদ্বাস্তু ও রাজদ্রোহী নজরুলের সহিত্য চর্চার জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ছিল শিয়ালসোল হাই স্কুলের দশম শ্রেনী এবং স্বল্প সময়ের জন্য বাড়িতে কিছু কিছু আরবি-ফার্সি চর্চা। তাঁর স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষার শূণ্যতা পূরণ করেছিল বুনেদী পরিবারের ঘরোয়া পরিবেশ, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, বিরাট ফার্সি-সাহিত্য সংস্কৃতি, হিন্দু শাস্ত্র ও পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত দারুন বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিকতম ধারনা। নজরুলের চেয়ে তিন গুন বেশী সময়ে সাহিত্য সাধনা করে রবী ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে একক বৈশিষ্টে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। নজরুল রবী ঠাকুরের পূর্ণ বিকশিত কালের সমসাময়িক। খেলাফত আন্দোলন থেকে ভারত ছার আন্দোলনের মধ্যবর্তী শান্ত সময়টুকুর মধ্যে নজরুলের যাত্রা শুরু হয় এবং এরই মধ্যে ঘটে তাঁর মহা প্রস্থান। রাজদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, রুটিরুজির চিন্তামগ্ন যাযাবর সম নজরুল একটি বিশাল মহীরুহের ছায়া তলে ক্ষুদ্র কিশলয়সম রবী ঠাকুরের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও ছোঁয়া থেকে নিজেকে মুক্ত ও নিরাপদ অবস্থানে রেখে নিজস্ব রীতিতে সাহিত্য সাধনা করে এক নবযুগের আগমন বার্তা ঘোষনা করেন। তাই নজরুল একজন যুগস্রষ্টা কবি। বাংলার সাহিত্যাকাশে রবী রশ্মিও মাধ্যমিক প্রাচুর্য্যরে সময়ে নজরুলের আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরে যায়। যে সময়ে মীর মোশারফ হোসেন ও মহাকবি কায়কোবাদ স্ব স্ব রচনায় ঈশ্বর ও পরমেশ্বর শব্দ ব্যবহার না কওে পারেন্নি, সে সময়ে নজরুলের লেখায় একদিকে যেমন রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠে, তেমনি স্বীয় মহীমায় সমুজ্জল ইসলামের গৌরব দীপ্ত জয়গান ''ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমরা সেই সে জাতি, সাম্য মৈত্রি এনেছি আমরা, বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি'', '' তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানি তাগিদ'', ''খয়বর জয়ী আলী হায়দার

জাগো আর বার, দাও দুষমন দর্গ বিদারি দুধারি তলোয়ার'', '' কারো ভরসা করিসনে তুই, এক আলøাহর ভরসা কর, আলøাহ যদি সহায় থাকেন, ভাবনা কিসের, কিসের ডর'' পাবিনারে তুই পাবিনা খোদাওে ব্যথা দিয়া তাঁর মানুষের প্রাণে্ সে আঘাত লাগে কাবার ঘরে'', ''আলøাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান্'' ''বাজিছে দামামা, বাধঁরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান্'', ''ইসলামের ঐ সওদা লয়ে, এলো নবীন সওদাগর, দে যাকাত, দে যাকাত, ও তোর দিল খুলবে পরে, ও তোর আগে খুলুক হাত্'', ''তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখেছ কি তার প্রাণ; অন্তওে তার মমতা নারী, বাহিরে শাহজাহান্ জেগে উঠ হীনবল ! আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল্'', প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয়ী আহবান আশান্ত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত করে।

নজরুলের কোরবানি, মুহররম, রণভেরী, শব-ই-বরাত, সাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, নওরোজ, ঈদেও চাঁদ, বকরীদ, ঈদ মোবারক, খোশ আমদেদ, অঘ্রানের সওগাত, মরুভাস্কও, আজাদ, খালেদ প্রভৃতি জাগরন মূলক রচনায় নজরুলের কণ্ঠে ইসলামের অমিয় প্রাণ বানী ধ্বনিত হয়েছে। ইসলামের আদর্শ-দর্শন থেকে সরে পড়া মুসলমানদের কুসংস্কার ও গতানুগতিকতার পথ থেকে ফিরিয়ে এনে একটি অতীত সচেতন জনগোষ্ঠীতে পরিনত করে। অতীত সচেতন পশ্চাদ পদানত। এই অতীত সচেতনতাই এক সময়ে পাশ্চাত্যে অতীত-প্রিয়তার জন্ম দিয়ে রেনেসাঁর উদ্ভব ঘটায়। অতীত এবং বর্তমানের ভেদ থেকেই ভবিষ্যতের ভাবনা ও দিক নির্দেশনা স্ফুরিত হয়। এসকল জাগরনধর্মী গান ও কবিতাতে স্ব-সম্প্রদায়ের স্বপ্ন-আশা-আকাংখা চেতনার মূর্ত প্রতীক নজরুল। সকল নির্যাতন জুলুম-শোষন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোচ্চার ছিলেন নজরুল। একুশ বৎসর বয়সে বিদ্রোহী নামক জ্বালাময়ী কবিতা লিখে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেন তিনি। শুধুমাত্র দেশীয় বা জাতীয় চেতনা-অনুভূতিই তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়নি। মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বলেন- প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদেও সর্বনাশ। বিদ্রোহী কবিতায় যখন নজরুল বলেন- আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার, নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি, শান্ত উদার- তখন পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের স্বেচ্ছাচারী পাশব শক্তিকে উৎখাত করে অনাবিল শান্তি আনয়নই তার লক্ষ্য নয়, গোটা বিশ্বের শান্তি তাঁর লক্ষ্য। জগত জুড়িয়া এক মানব জাতির চিন্তা চেতনা দর্শণ তাতে পরিস্ফুট। আমি উত্থান, আমি পতন, আমি বিশ্ব তোরনে বৈজয়ন্তী মানব কেতন' এখানে স্বদেশ চেতনা, স্বদেশ বা জাতি বিশেষিত হয়নি। স্বাজাত্যবোধ বা স্বাদেশিকতা তাকে সীমায়িত করে রাখতে পারেনি। এ উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবাই মিলে-মিশে বাস করছে এবং সবার প্রথম পরিচয় মানুষ। নজরুল মানুষের কবি। ধর্ম হোক, শোষন হোক, অন্যায় অত্যাচার হোক সবক্ষেত্রেই মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি। সবার উপরে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ, তা তিনি ঘোষনা করেছেন উচ্চকণ্ঠে। তিনি সেই মানুষের জয়গান করেছেন, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষের কথা বলেছেন নির্ভয়ে, সত্যের পথে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে বারবার, অত্যাচার, জেল, জুলুম তাকে দমাতে পারেনি। জয় নিপীড়িত প্রাণ, জয় নব অভিযান, জয় নব উত্থান'। বিশ্বের ভাবানুভূতির প্রতিবিম্বন এখানে দৃশ্যমান।

আমাদের কন্যা, জায়া, জননীদের মহিমা প্রচারের লক্ষ্যে তিনি ঘোষনা করেন সর্ব প্রথম মুসলমান নর নহে, নারী। বিশ্বে যা কিছু চির কল্যাণকর, অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর, বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ, অশ্রুবারি, অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী। এখানে শুধু বাঙ্গালি নর ও নারী কবির দৃষ্টি আবিষ্ট করে রাখেনি। খালেদ ! খালেদ ! ভাঙ্গিবে নাকি হাজার বছরি ঘুম, মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম। আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত, দারুন স্বেচ্ছাচারী। যুবাদের লক্ষ্য কওে নজরুল বলেন- ধর্ম-বর্ণ, জাতির উর্দ্ধে জাগরে নবীন প্রাণ, তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান; সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ভূল, সকল মানুষের উর্দ্ধে তুলিয়া ধর। মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। নারীরে দিয়াছি মুক্ত, নর সম অধিকার, মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া, করিয়াছি একাকার। এ সবই হলো নজরুলের মানবতার গান। সকল গন্ডি ও সীমামুক্ত চেতনাই কাজ করেছে নজরুলের রচনায় যা কোন দেশ বা জাতির একার নয়, বরং সারা বিশ্বের।

খালেদ ! খালেদ ! ফজর হলো যে আজান দিয়েছে কৌম। ঐ শোন আস্-ছালাত খাইরুম মিনান নৌম ! ঘুমাইয়া কাজা করেছ ফজর, তখনো জাগোনি যখন জোহর; হেলায়-খেলায় কেটেছে আছর, মাগরিবের ঐ শোন আজান; জামাতে শামিল হওগো এখনো জামাতে আছে স্থান। নজরুল বিহনে কেউ বল্তে পারতোনা ''শহীদি ঈদগাহে দেখো আজ জমায়েত ভারী, হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি। ঘোষিল অহুদ আলøাহু আকবার, ফুকারে তুর্য তুর পাহাড় ! মন্ত্রে বিশ্ব রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলøাহু আকবার্ । তুমি জাগো মুক্ত বিশ্বের বন্য শিশু তুমি, তোমায় পোষ মানায় কে? আলøাহু আকবার তোমার হুঙ্কার ! আলী তোমার হুঙ্কার। কবি কাজী নজরুল না এলে, বিশ্ব মুসলিম মানস এমনি স্বচ্ছ, সুন্দর, সাবলীল ভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুল্তে পারতোনা আর কেউ ? নজরুল নিজেকে সকল দেশের, সকল মানুষের বললেও তার কাব্য-সাহিত্যে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যা একান্ত ভাবে খন্ডিত বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় স্পন্দন ও আত্মার প্রতিবিম্ব। তাঁর সাহিত্য সত্ত্বায় ও চিন্তার আত্মায় যে আদর্শ অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত, তার কারনেই ওপার বাংলায় ক্ষুদ্রহয়েছেন নজরুল-উপেক্ষিত, অবহেলিত, অশ্রদ্ধেয়, সমালোচিত ও চর্চার অযোগ্য হয়েছেন তিনি।

নজরুলের সাহিত্যে-কবিতায় ও সঙ্গীতে শুধু হিন্দু-মুসলিমই নয়, সবধর্ম, বর্ণ, গোত্র-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আবেগ-অনুভূতির স্বচ্ছ অভিব্যক্তি ঘটেছে। একদিকে যেমন ভক্তমনের গভীর অনুভূতি দিয়ে শ্যামা সঙ্গীতে নিজেকে উজাড় কওে দিয়েছেন- যেখানে হিন্দু বৈষ্ণব কৃষ্ণের লীলা খেলায় আত্মভোলা; শাক্তহিন্দু কালির পদতলে আলোর নাচন দেখে উলøাসিত হন; অচ্ছুৎক্ষুদ্র আপনার মাঝে রুদ্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন-অপর দিকে তেমনি মুর্দে মুমিন আপন বক্ষে পবিত্র কাবার ছবি দেখেন, ঈদের চাঁদ দেখে খুশীর ফোয়ারা বইয়ে দিয়ে বলবেন 'মোবারক হো' এখানেই নজরুলের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব। এ ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই।

রবী ঠাকুরের অনন্য সাধারন ও ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি প্রতিভায় বাংলা কব্যেও ভাষাছন্দ, আঙ্গিক ও সামগ্রিক পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন করে স্বতন্ত্র্য রবীন্দ্রিক কাব্যভাষা তৈরী করেছেন। তাঁর চিরায়ত সাহিত্যের ব্যাপ্তি এতই বিরাট ও বিশাল যে এক জীবনে তা পড়া শেষ করা যায়না। রবী ঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্বে কারো দ্বিমত নেই।

বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালি কবি হিসাবে তাঁর সাহিত্য কর্ম আমাদের গর্বের বস্তু। তাই রবী ঠাকুরকে নিয়ে আমাদেও গর্বে-শ্রদ্ধায় এতটুকুন কার্পণ্য নেই। তা তাঁর জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী, কবিতা, সঙ্গীত, আলোচনা-আবৃত্তির আসরের সংখ্যা, ব্যাপ্তী-ব্যপকতা ও জৌলুস এবং মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা থেকে অতি সহজেই অনুমেয়। তারপরও স্বীয় ধর্ম ও জাতিগত অনুভূতি ও ভাবাবেগের বাইরে যেতে পারেননি রবী ঠাকুর। বাংলা ভাষার বিবর্তন ও বিকাশের ক্ষেত্রে ফার্সি সংস্কৃতি ও পার্সি ভাষার প্রভাব; আরবী-ফার্সি-উর্দ্দু-তুর্কী শব্দ ও অলংকার সম্ভার যে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য্য, সাবলীলতা ও অর্থবহতা বৃদ্ধি করেছে তার কোন পরিচয় বা ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার রবী ঠাকুরের রচনায় নেই। স্ব সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যানু প্রিয়তা ছাড়া তাঁর সাহিত্যে মধ্যযুগীয় আরবী-ফার্সি-উর্দ্দু-তুর্কী শব্দ সম্বলিত ভাষার এবং ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র জন মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় মিলেনা। প্রকারান্তওে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তৎসম পন্ডিতদেও সৃষ্ট এবং সংস্কৃত শব্দ সমন্বিত ভাষার ক্রম বিবর্তিত ধারাটিই পরিদৃষ্ট হয়। মধ্যযুগে পারসিক ভাষা-সংস্কৃড়ু ও আধুনিক যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ছোঁয়াচ এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শুধু উপাদানগত দিক দিয়েই সমৃদ্ধ হয়নি, ভাষার রূপ-রীতি-শব্দ সম্ভার ও প্রকাশ ক্ষমতার দিক দিয়েও বলীয়ান হয়েছে। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রনে শংকামুক্ত মন নিয়ে নজরুল যে বাংলা সাহিত্য রচনা করেছেন তা হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই সাহিত্য।

বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনের শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিদের জীবনাচরন থেকে এটিই স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় যে, সৎ এবং মহৎ লেখকের কোন জাত বিভাজন নেই। তিনি শুধু ব্যাক্তি বা ব্যাষ্টি নন। তিনি সাকল্য এবং সমষ্টি। তার থাকেনা শ্রেনী ও বর্ণ বৈষম্য ও ধর্মাধর্ম ভেদ। তিনি সততঃই নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত ও নিরহঙ্কার। তিনি সকল দেশের সকল কালের। চিত্তের শুদ্ধতায় ও মন মানসের প্রসারতায় তিনি দেশ-কাল ও কৌলিন্যেও কালিমা মুক্ত। দেশের সকল অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে ভালবাসাই তার লক্ষ্য। দেশের কোন সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণা-অবজ্ঞার চোখে দেখা বা স্বীয় শিল্প-সাহিত্যে অনুলেøখ্য রাখার অর্থ জাতীয় ঐক্যে আঘাত হানা। সাবেক পূর্ব বাংলার কুষ্টিয়ার শিয়ালদহে, পাবনার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ও নওগাঁর পতিসরে জমিদারে দেখতে এসে পানসি চড়ে কখনো বা আটবেহারা বাহিত পালকিতে বসে এ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী মুসলমানদেও খুব কাছ থেকে দেখেছেন রবী ঠাকুর। তবু মানসিক কারনে সীমা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেননি তিনি। ঐতিহাসিক সচেতনতার অভাব, জাতিগত সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক গন্ডিবদ্ধতার কারনে মুসলিম ইতিহার-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তাঁর রচনা প্রচন্ডভাবে অনুপস্থিত। আপামর জনসাধারনের সকল অংশের অনুভূতির মূল্য ও স্বীকৃতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি তার রচনায়। ক্ষেত্র বিশেষে উহা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খার সঙ্গে বিরোধ পূর্ণ তার আদি পুরুষ নীলরতন ঠাকুর মুসলিম দরবারে একজন আমিন বা সার্ভেয়ারের পদে অধিষ্ঠিত থেকে কলকাতার জোড়াসাকোঁর ভবিষ্যত জমিদারির ভিত রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তদুপরি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের ভিত্তিতে মধ্যযুগের শত শত বৎসর ব্যাপী মুসলিম শাসনামলে বেনিয়া ইংরেজ প্রদত্ত সুবিধা ভোগী হিন্দুদের পূর্ব-পুরুষগন মুসলিম পোষাক পরে, ফার্সি ভাষায় কথা বলে বাদশাহ-সুলতান-নবাবদের উদার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়ে সুখী সুন্দর জীবন যাপন করলেও রবী ঠাকুরের মতো এক বড় প্রতিভা সে কৃষ্টিবান সমাজের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ভাষার স্থান দিয়ে অমরত্ব দানে

দুঃখজনক ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্যই অনন্য সাধারন প্রতিভা ও সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতার অধিকারী যুগ স্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রকৃত রূপকার।

নজরুলের আবির্ভাব না ঘটলে মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য রবী ঠাকুরের নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্নের মতো সময়ের সমুদ্রে বুদবুদেও ন্যায় অলক্ষ্যে মিলিয়ে যেতো। রবী ঠাকুরের সাহিত্যে কদাচিত কোথাও মুসলিম প্রসঙ্গ এলে, মুসলিম চরিত্র চিত্রনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতার লাশ করা হয়েছে, যেমন- আব্দুল মাঝি ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার ন্যাড়া; স্ℓেচ্ছ সেনাপতি এক মুহমদ ঘোরী তস্করের মত আক্রমিতে দেশ। পাঠান-মোঘলদের শাসন ভারতবর্ষেও ইতিহাস নয়, নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। বহিরাগত আর্য অধঃস্তন রবী ঠাকুরের রচনায় বাংলাভাষী মুসলমানের কি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও অনীহা মিশ্রিত চমৎকার মূল্যায়ন। এগার সিন্ধুর দুর্গের সম্মুখে রাজপুত্র সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে ঈশা খাঁনের ইতিহার খ্যাত যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পাদিত হয়। রাজপুত্র সেনাপতি মানসিংহের ভগ্ন তরবারির সুযোগ পেয়েও অসহায় প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বীরোচিত উদারতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করে ঈশা খাঁ স্ব সম্প্রদায়গত মানসিক প্রশস্ততার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। হত্যার বৈধ সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও মুসলিম বীর ''মারি অরি পারিযে কৌশলে'' যুদ্ধনীতির আশ্রয় নেননি। মানবতার এরূপ বিরল ঘটনা রবী ঠাকুরের রচনায় অনুলেℓখ্য থাকলেও, মুঘল সেনাপতি আফজাল খাঁর সঙ্গে এটে উঠতে না পেরে শঠতার ভান কওে নিজ শিবিরে আমন্ত্রন করে এনে কাপুরুষ শিবাজী আপোস-আলোচনার নাম করে নিরস্ত্র অবস্থায় অতর্কিত আক্রমন করে আফজাল খাঁকে হত্যা করেও সে ধূর্ত পার্বত্য মুষিক পতিত পাবন শিবাজী রবী ঠাকুরের পরম পূজনীয়। এক ধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেধে দেওয়ার প্রশস্তি গেয়েছেন রবী ঠাকুর। জানিয়েছেন সশ্রদ্ধ পনতি। ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে, সেই বর্গী বা মারাঠা লুন্ঠনকারীরা ছিল বাংলার ত্রাস। তাদেরই কেন্দ্রীয় ব্যাক্তি শিবাজীকে দিয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ নিয়ে অখন্ড ভারত গড়ার লক্ষ্যে রবী ঠাকুর বলেন- এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে, এক কণ্ঠে বলতো জয়তু শিবাজী, মারাঠীর সাথে আজিহে বাঙ্গালি এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি। তারপরও রবী ঠাকুর মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক। রবী ঠাকুরের সাহিত্যে বিধৃত সংস্কৃতির মূল উৎস আর্য সংস্কৃতি, যা নীরেট হিন্দু জাতিয়তাবাদ থেকে উদ্ভূত, যার সঙ্গে বাংলাভাষী মুসলমানের আহার-বিহার, আচার-আচরন, সমাজ সংগঠন, মন-মানস-চেতনার কোন প্রকার সংগতি বা মিল নেই। একমাত্র ভাষাগত মিলের কারনে এদেশীয় বচনবাগীষ বঙ্গসংস্কৃতি সেবীরা অধুনা রবী ঠাকুরকে বাঙ্গালি জাতিয়তাবাদের রূপকার ও পথিকৃত বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সামাজিকভাবে বাহ্যিক কিছু কিছু মিল থাকলেও বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ বলে কোন সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আজও কেউ খুঁজে পায়নি। আর যদি স্বার্থবাদী কোন মহলের দৃষ্টিতে এমন জিনিসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে থাকে, তাহলেও দুয়ের মধ্যে কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই। সেই জন্যই ঋষিরাজ বলেছেন- বাংলা শুধু দেহেই দুই নয়, অন্তরেও দুই। তারপরও ভারত পন্থী বুদ্ধিজীবীরা এ দেশে রবীন্দ্রিক ভাব বিপℓব ঘটানোর অপপ্রয়াসে সদাব্যস্ত।

বাংলা ভাষাভাষী রবী ঠাকুরকে এপারে যতোই ধূপ-ধূনাবেষ্টিত বিশাল আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হোক না কেন- ভারত কখনো রবী ঠাকুরকে জাতীয় ভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি; বরং ভারতের পঁচিশটি প্রদেশের একটি মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র চর্চাও রবীন্দ্র শ্রদ্ধা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমায়িত রাখা হয়েছে। এপারে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে আন্দোলন ও আত্মোৎসর্গেও উজ্জ্বল নজীর স্থাপন করা হয়েছে, তার বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে উঠেনি। পশ্চিবঙ্গবাসীরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গ্যাঁড়া কলে আটকে গেছে। আধুনিক বাঙ্গালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা মধ্যযুগীয় মুসলিম বাদশাহ-সুলতান-নবাবদের আস্তাবল ও পিলখানার লস্করদের কথ্যভাষা হিন্দিকে এককালে খুবই ঘৃনা করতেন। সেই হিন্দিকে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে ১৯৬৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বিনা প্রতিবাদে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রদান করে। সারা ভারতের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ লোকের মুখের ভাষা হিন্দির বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত পশ্চিবঙ্গের তুখোর বাঙ্গালীরাও একদিন আন্দোলনে নামেনি। আমরা সগৌরবে আমাদেও বাঙ্গালিত্ব বজায় রেখে চলছি। নিজেদেও বাংলাভাষাটি ও টিকিয়ে রাখতে পারেনি তারা। বাঙ্গালিদের রাষ্ট্র ভাষা হলো হিন্দি এবং জাতীয়তা হল ভারতীয়। বাঙ্গালি বলে বিশ্বে কোন পরিচয় দেবার সুযোগটিও রইলনা তাদের। তারপরও এপারে এসে বাঙ্গালি বলে শুঁড়-শুঁড়ি দিয়ে আমাদের একতাও সংহতি বিনষ্ট করার অশুভ পাঁয়তারা করছে। অধিকন্তু, রবী ঠাকুর নিজের হিন্দুত্ব বজায় রাখার জন্য বাঙ্গালি নয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল ছিলেন। বঙ্গ সংস্কৃতি সেবীরা হয়তো ওয়াকেফহাল নন যে, হালে দুরদর্শনের বাঙ্গালি সঙ্গীত শিল্পীরা ভীষনভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, আকাশ বানীর কর্তৃপক্ষীয় বিমাতাসুলভ আচরনে। কলকাতার সাহিত্যিকরা মনে করতেন বাংলা সাহিত্য চর্চা কেবল কলকাতাতেই হয়, অন্য কোন খানে হয়না। সেদিন আর নেই। বর্তমানের কলকাতায় বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য হিন্দু ভাষা ও হিন্দুয়ামী সংস্কৃতির চাপে মৃতপ্রায়। তাইতো কলকাতার সাহিত্যিক সম্পাদকদের দেখা যায় বাংলাদেশে তাদের বই-পত্র-পত্রিকার বাজার খুঁজতে, কেননা সমাদরের অভাবে কলকাতার উঁচুমানের পত্রিকা দেশ বাংলাদেশের বাজার হারিয়ে অপমৃত্যুর প্রহর গুনছে।

ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা ও ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে থেকে লেখক যদি আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্য বিচার নিরপেক্ষ ও আবেগহীন না রাখেন, তাহলে সাহিত্য কম্রের রূপ পালটে যায় এবং সত্য চলে যায় বহু দুরে। রবী ঠাকুরের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বে কারো কোন রূপ মত বিরোধ না থাকলেও, তাঁর কাছ থেকে আমাদের যতটুকু নেবার, তা আমরা নেব তাঁর মাঝে যা আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপন্থী, তা আমরা মেনে নিতে পারিনা। তাই রবীন্দ্র বঙ্গসেবীদের উপলব্ধি করা উচিত রবী ঠাকুরের প্রতি আমাদেও শ্রদ্ধা-অনুরাগ সাহিত্যের পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি দোষনীয়।

পর সম্প্রদায়কে বিন্দুমাত্র আঘাত না করে স্বধর্ম ও স্বদেশের উন্নয়ন ও সংহতি সাধনের আন্তরিক প্রয়াস ও নির্মল বানী অসাম্প্রদায়িকতার প্রতীকী পুরুষ নজরুলের সাহিত্যে দেদীপ্যমান। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি কোন বিদ্বেষ কোন ঘৃণা বা কটুক্তি নজরুল সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম-কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন যাত্রা প্রনালীর বিভিন্নতা সত্বেও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের আদর্শ, সাম্য ও মৈত্রীর সদিচ্ছা লালন করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবি হিসাবে সমাদৃত। তাইতো পশ্চিম বঙ্গেও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অন্নদা শংকর রায় বলেন- ভূল হয়ে গেছে বিলকুল, আর সব ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়নি কেবল নজরুল। তারপরও ওপারের দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ও দীপক রায়ের আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন-এ ৬৩ জন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি এদেশের কবি শামছুর রহমান যাদবপুর য়ুনিভার্সিটি

কর্তৃক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত হলেও বাবুদের আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনে কোন বরাদ্দ পাননি। এ কুলের জীবনানন্দ দাস সীমান্ত পেরিয়ে কোন রকবে বাংলা কবিতা সংকলনে ঠাঁই কওে নিতে পারলেও আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সুফিয়া কামাল, ফররুখ আহম্মেদ, আল-মাহমুদ প্রমুখ বাংলাভাষী একজন মুসলিম কবি ও ওপারে কবিদের পংক্তিভূক্ত হতে পারেননি। এরূপ একটি নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দুর্গন্ধময় মনোভাব নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থ ও এদেশের কতিপয় বই বেপারী তাক সাজিয়ে রেখেছেন ঢাকার বাজারে।

মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গ যেমন রয়েছে নজরুলের জারি, সারি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গানে-গজলে-সঙ্গীতে যা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদেও বিরুদ্ধে এক জেহাদী ফরমানের ন্যায় মর্দে মুমীনের দীলকে উদ্বেলিত করেছিল তেমনি হিন্দু ঐতিহ্য মন্ডিত ভজন-কীর্তন-শ্যামা-বাবু-ভক্তি গীতি ও পদাবলীতে হিন্দুমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বিদ্রোহী কবিতায় আরবী-ফার্সি-উর্দু-তুর্কী শব্দের পাশাপাশি হিন্দু পুরাণের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন নজরুল। এ জ্যোতির্ময়ী প্রতিভার কারনেই বঙ্গ সরস্বতী ও নজরুলকে সম-সাময়িকতার স্বচ্ছ দর্পণ পদবী প্রদানে কুণ্ঠিত হননি। কোরআনও পুরানের সমন্বয় প্রয়াস নজরুলের প্রায় সব কবিতাতেই পরিদৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এ অখন্ডকে খন্ডিত করে কেউ কেউ বলেন- নজরুল ইসলামী কবি। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে উনি শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। আর কেউ বলেন- তিনি খন্ডিত কবি; তিনি সার্বজনিন কবি নন। মুসলমানের সদিচ্ছাকে সহিত্য রূপ দিতে গিয়ে নজরুল হয়েছেন সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল। ব্যাক্তি ও কর্ম জীবনে বরাবরই নজরুল ছিলেন বিরূপ পরিস্থিতির শিকার। প্রতিকুলতা ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা তার প্রতিভার সম্যক বিকাশ দারুনভাবে ব্যাহত করেছে। এরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার না হলে নজরুল আরো বড় হতে পারতেন, আরো মহত্তর কবিতা-সঙ্গীত-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন। ধর্মেও প্রতি বিশ্বাসই যদি নজরুলের অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কারনে রবীঠাকুর বড় অপারাধী। হিন্দুত্ব ছাড়া অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব মুছে ফেলার লক্ষ্যে তিনি বলেছেন ''এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে, এ মহাবচন করিব সম্বল''। মহাত্মা গান্ধীও ইয়াং ইন্ডিয়াতে বলেছেন ''আমি আমার নিজের মক্তির জন্য সব কিছুর চেয়ে বড় করে দেখি ধর্মকে। তাই আমি সর্বপ্রথম হিন্দু, তারপর দেশ প্রেমিক''।

নজরুলের কবি-মানসের সঙ্গে একটি অতি উজ্জ্বল মুসলিম সাংস্কৃতিক চেতনা ও প্রদাঢ় ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করেছে। তিনি বলেছেন ''আলøাহ আমার প্রভূ, রসূলের আমি উম্মত, আল-কোরআন আমার পথ-প্রদর্শক''। তদুপরি জীবন সায়াহ্নে আমাদেও জাতীয় কবি গেয়েছিলেন- মসজিদের পাশে আমার কবর দিয়ো ভাই, যেনো গোর থেকে ও মুয়াজ্জীনের আজান শুনতে পাই।'' মনের গভীরে ধর্মীয় আকর্ষন তথা ধর্ম নিষ্ঠার কারনেই তিনি সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর ত্রিভূবনের নবী মুহম্মদ 'আমার প্রিয় হজরত নবী কমলিওয়ালা, 'সাহারাতে ফটলরে ফুল' 'ওমন! রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ, ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, খয়বর বিজয়ী আলী হায়দার, জাগো জাগো মুসলমান, প্রভৃতি ধর্মীয় গানে মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলেন, এবং বাঙ্গালির শ্যাম-কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল সিরাজীর আবেগ-বিহবলতা দান করেছেন বলেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল এবং কারো কারো কাছে অনাদৃত ও আলোচনার অযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের ধর্মাচরনে কোনরূপ বাধা নেই, এ সাম্য্য-মৈত্রী ও অসাম্প্রদায়িকতার পবিত্র ভূমি-বাংলাদেশে। কিন্তু মুসলমানি কিছু হলেই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক। ধর্মেও প্রতি অনুরাগ ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয়। এটা সর্বধর্মাবলম্বীর জন্মগত অধিকার। কাজেই তো এখানে যে আবেগ, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার গভীরতা দিয়ে নজরুল চর্চা চলে, সে আবেগ আন্তরিকতার মধ্যে ওপারের বাঙ্গালি হৃদয়ে নজরুল বেঁচে নেই। ১৯৭১ সালের পরে সরকারী নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত পজ্ঞাপন জারির পর থেকে কবির জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে নজরুল জয়ন্তি পালিত হয়না। ১৯৭২ এর মে/জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলাদেশে নজরুলকে বিসর্জন দেয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য অঙ্গন থেকে নজরুল অপসৃয় হয়েছেন। চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী অঙ্গন তছনছ হয়ে পুর্বেকার গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছে কারন নজরুল মুসলমানের কবি।

অঢের ভজ্জন-কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, বাবুভক্তি গীতি রচনা কওে এককালে সমাদৃত হলেও; সাম্যবাদী, প্রলয়শিখা, সর্বহারা লিখে কট্টর সমাজবাদীদেও প্রিয় পাত্র হলেও তিনি মুসলমান। স্বধর্মনিষ্ঠাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি অপরাধী। ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীন, যতীন, রঙ্গলাল, মোহিত লাল, মধুসুদন, শরৎ, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, অমীয়, জীবনানন্দ, সুকান্ত চক্রবর্তীরা ধর্মীয় গন্ডির মাঝে থেকে মহাভারতীয় জাতীয় সহিত্য রচনা করলেও, নজরুল তাঁদের মতো আলোচিত বা মূল্যায়িত হননি। তাইতো নজরুলকে এড়িয়ে চলা হীনমন্যতা গ্রস্থ বুদ্ধিজীবীদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নজরুলের প্রতি অনীহা ও উৎক্ষেপন, নজরুলের অবমূল্যায়ন ও সমালোচনার অন্তরালে একটি ঘৃন্য ষড়যন্ত্র কাজ করছে। ব্রিটিশ আমলে নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী/রাজদ্রোহী। '৪৭ উত্তর কালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে অনাদৃত হয়েছিলেন বাঙ্গালি বলে। '৭১ উত্তর কালে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ও দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখার এবং দেখানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নজরুলের ন্যায় দুরদর্শী, উদার হৃদয় মনীষির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। নজরুলের চেয়ে ছোট মাপের কবি-সাহিত্যিকদেও আজকাল বিলক্ষন মাতামাতি হলেও, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে সঠিকভাবে মূল্যায়িত বা আলোচিত হচ্ছেন না নজরুল।

রবী ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। রবীন্দ্র সৃষ্টি উৎকর্ষ বিশালতাও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তিনি একটি যুগ। বাংলাভাষাভাষী মানুষের জন্য রবী ঠাকুর একটি বিস্ময়। তাঁর সাহিত্য-কবিতা-গান মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই তিনি নিঃসন্দেহে বরনীয় ও স্মরনীয়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্ব পর্যন্ত পাঠ্য সূচীতে এক সুউচ্চ আসনে সমাসীন রয়েছেন। আল্পনা এঁকে, বন্দনা গেয়ে, ধূপ-ধূনা-মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে অষ্ট প্রহর এদেশের অলি গলি শিক্ষাঙ্গন, একাডেমী, নাট্যসংঘ, মথত, মাঠ-ময়দান, পার্ক-চত্বর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, সঙ্গীত-কবিতার আসর, সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ়করন জলসা সহ রবীন্দ্রিক ছাড়াছড়িতে ভরপুর। করজোড়ে সূচনা সঙ্গীত গেয়ে, মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে ঋষি-বন্দনা করলে এদেশের মানুষের মনে হিংসার উদ্রেক হয় না। কেননা, এদেশবাসীর মন-মগজে, চিন্তাভাবনায় উদারতার ঘাটতি নেই। চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমী তছনছ কওে, বোর্ড পুড়িয়ে নজরুল মুসলমানের কবি বলে পোষ্টারিং করা হলে, মসজিদ-মাযার-কবরস্থান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলেও এদেশের মানুষ আত্নকেন্দ্রিকতার ঘৃন্য অভিশাপে অভিশপ্ত নয়। যার যতটুকু পাও না, তাকে ততটুকু দেয়ার মধ্যেই মনের ঔদার্য্য প্রকাশ পায়; সমন্বয়-সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রশস্ত হয় এবং পারিপার্শ্বিকতার কিছুর

পরিমিত অবস্থান ও শৃঙ্খলা মন্ডিত উপস্থাপনার মধ্যে যথাযথা সৌন্দর্য্যরে বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মানসিক সংকীর্ণতা ও সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি, ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা ও বিচ্ছিন্নতা বিদুরিত হয়। রবী ঠাকুরের জন-গন-মনের অধিনায়ক ও ভারত ভাগ্য বিধাতা ইংরেজ ও পার্বত্য মুষিক শিবাজির বর্গী প্রীতির কথা সম্যক জেনেও বঙ্গমাতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারনা সম্বলিত প্রতিমা পূজার বানী বাহক বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের উত্তেজক সঙ্গীত সোনার বাংলা-কে এদেশের জাতীয় সঙ্গীত বানানো হয়েছে। এতে বাংলাদেশ বা তার জনগনের সকল অংশের অনুভূতির মূল্য ও স্বীকৃতির প্রতিফলন নেই। তবু শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশীরা টু শব্দটি করছেনা। পান্ডিত্যে যথেষ্ট উন্নত মানের বঙ্গ সংস্কৃতি সেবীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের কবি রবী ঠাকুর কে শুধুমাত্র ভাষা ও ভাষাগত মিলের কারনে হালে রাজনীতি, দেশপ্রেমও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে জড়িত করে তাকে ক্রকান্বয়ে বিতর্কিত কওে তুলছেন। ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ন জাতীয়তাবাদ নহে। একারনেই গ্রীক ও তুর্কী সাইপ্রিয়টদের মধ্যে, কিংবা আইরিশ ও ইংলিশ স্বাথের্র মধ্যে এতো রক্তারক্তি ও হানাহানি চলছে। এতেই বুঝা যায়, এক ভাষার ভিত্তিতে কোথাও জাতি বা জাতীয়তার সৃষ্টি হয়নি। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কিংবা মাতৃভাষা প্রীতির সুত্র যদি এতই মজবুত হতো তাহলে ১৯৪৭-এ বঙ্গবিভাজন হতোনা। তারপরও এদেশীয়রা কুট প্রশ্নের অবতারনা করে, রবী ঠাকুরকে ছোট করতে চায়নি। বাংলাদেশের গনমাধ্যম-রেডিও-টেলিভিশন-ই নয়, দেশের সর্বত্র মহাসমারোহে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা পালিত হয়। দেশের পত্র-পত্রিকা সাময়িকী গুলো নিঃসঙ্কোচে সেখবর পরিবেশন করে থাকে। এমনকি নজরুল বার্ষিকীতেও এদেশের আত্নবিশেøষনের ক্ষমতা বঞ্চিত সুচতুর বঙ্গ সংস্কৃতি সেবীরা ধূতির আচল ধরা শিশুর মতো রবীন্দ্র কৃতির আত্নিকরনে-সৌন্দর্য্যরে ব্যাখ্যা-বিশেøষন কওে স্বীয় সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকে।

নজরুল আমাদের স্বতন্ত্র্য জাতি প্রতিষ্ঠার অগ্রসৈনিক ও জাতীয় কবি। জাতীয় পর্যায়ে অন্য যেকোন কবি থেকে নজরুলের মর্যাদা বেশী এবং নজরুলের উপর যে অনুষ্ঠান হবে তা জাতীয় অনুষ্ঠানের দাবী রাখে। অন্যদিকে রবীন্দ্র ভক্তিতে শ্রেষ্ঠদের কারসাজিতে রবীন্দ্র জয়ন্তি এখন জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান মালার সিড়ি ডিঙ্গিয়ে জাতীয় অনুষ্ঠানমালার পংক্তিভূক্ত হতে চলে্ছ। অথচ নজরুলকে বিচার করতে গেলেই তাঁর কাব্যও সঙ্গীতের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনাচরন কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস। সেকুলারিষ্ট মনোভাবাপন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাভাবান্বিত বুদ্ধিজীবীরা তাঁর নাড়ীতে মুসলমানের গন্ধ পান। তাঁর স্বধর্মনিষ্ঠা অনেকেরেই চক্ষুশূল। আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়ার মানুষেরা ইংরেজী ভাষী হলেও উইলিয়াম সেক্সপীয়ার কিন্তু তাদের মহাকবি বা জাতীয় কবি নন। সেকুলার বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীভূক্ত ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম অন্যান্য সেকুলারিষ্ট মনোভাবাপন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবান্বিত বুদ্ধিজীবীর মতো ব্যথিত হয়ে বলেছেন- রবীকে প্রতিপক্ষ করে নজরুলকে দাঁড় করানো জাতীয় কবি রূপে। একাজ কোন গন্ডমূর্খ করেনি, করেছেন আমাদের তথাকথিক বুদ্ধিজীবীরা। পাক আমলে আলøামা কবি ইকবালের উপস্থাপনাও ঐগোষ্ঠীর মর্মবেদনার কারন ছিল। কি অসহনীয় অন্তর্জ্বালা তাদের !চিতার আগুন নিভে গেলেও তাদের চিত্তের আগুন নিভ্েবনা।

আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গেও স্বীয় পাওনা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শেষ পর্বে রবী ঠাকুরের জন্য তিন অংকের নম্বর বরাদ্দ থাকলেও পশ্চিম বঙ্গেও সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যথা-যাদবপুর, কল্যানী, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, কলিকাতা-এমনকি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও নজরুলের কোন রচনা পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভোক্ত নয়। কলকাতার আলবার্ট হল, বেকার হল, রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, বিড়লা একাডেমী, এরনকি তালতলার পুরনো মুসলিম ইনস্টিটিউট-এও নজরুলের জন্ম মৃত্যু লগ্নে কোন আয়োজন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় না। ওপার বাংলার পথের মোড়ে মোড়ে, অফিস-আদালতে, প্রতিষ্ঠানের ফটকে, লেকে, পার্কে-চত্বরে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, বিধানচন্দ্র, প্রফুলøচন্দ্র, মদনমোহন, লালা লাজপাত, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বঙ্কিম, মাইকেল, শরৎ, চিত্তরঞ্জন, ক্ষুদিরাম, প্রফুলøচাখী, সুরেন্দ্র নাথ, দেবেন্দ নাথ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপীন পাল, জহরলাল, গান্ধী, ঈন্দিরা, রাজীব, সোনিয়া আরো কতো নাম জানা-অজানা ব্যক্তিদের অসংখ্য মূর্তি। কিন্তু কবি তীর্থ (আজকাল কবি কাজীর জন্মস্থান বা জন্মভিটা বলা হয়না ওপারে) চুরুলিয়ার পথে আসানসোলের মোড়ে কালো পাথরের একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি ছাড়া আর কোথাও গন-মানুষের কবি কাজীকে কোন সন্ধানী খঁজে পাবেনা। কলকাতার পাতাল রেলের দ্বাদশটি ষ্টেশনের মধ্যে রবীন্দ্র সদন রবীন্দ্র সরোবর নামের রেল ষ্টেশন থাকলেও কবি নজরুলের নামে কোন রেল ষ্টপেজ নেই। আমাদের রেডিও টিভির প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান সূচীতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে ভজ্জন-কীর্তন-শ্যামা সঙ্গীত ও গীত প্রচারিত হলেও অলইন্ডিয়া রেডিও, যার জন্য এক কালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম হাজার হাজার গান লিখে দিতেন, সে আকাশ বানী থেকে নজরুল বিলকুল অনুপস্থিত। এগারই জ্যৈষ্ঠ বা ঊনত্রিশে আগষ্টে কলকাতার পত্র-পত্রিকা ও গন মাধ্যমগুলো কবি নজরুলকে স্বরণ করেনা, ছাপা হয়না তাঁর কথা কাহিনী, পরিচিতি। ঐ বিশেষ লগ্নগুলোতে চিতপুর বা তালতলা মুসলিম ইনস্টিটিউটে কোন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় না। ওখানটাতে যেন তেন কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হলেও, ঐ বিশেষ দিন গুলোতে তাদের কল্পনা রাজ্যে নজরুল স্থান নেই। অতি সম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ঢাকা সফরে এসে বলে গেলেন- ওপারে নজরুলকে যতোটা বিদ্রোহী হিসাবে দেখা হয়, ততোটা সাহিত্যিক হিসাবে ভাবা হয় না। তথায় নজরুলের কবিতা, কবিতা হিসাবে বিশেøষিত হয়না। এমনটা ওপারের সুধিমনের বহিঃপ্রকাশ। আর এপারে রবীন্দ্র কর্ম, সার্বজনীন, রবীন্দ্র চর্চা কারো কারো কাছে ইবাদত তুল্য। রবীন্দ্র স্তোত্র ও বন্দনা বিহনে মোদের কোন কর্ম সাধিত হয়না। আবার কেউ বা রবীন্দ্র আদর্শে জীবন গড়ে তোলার এবং সময়-সুযোগে ঠাকুম্মার সঙ্গে বৃন্দাবন গমনের নছিয়ত খয়রাত করেন।

অধূনা বাংলাদেশে একাডেমিকভাবে রবীন্দ্র চর্চাও পদ্ধতিগতভাবে রবীন্দ্র গবেষনার কাজ চলছে। সামর্থবানদের ড্রইংরূমের সেলফ্ ভরে আছে রবীন্দ্র রচনাবলীতে। অথচ নজরুল সৃষ্টি দুস্প্রাপ্য রাজধানী শহর ঢাকাতেও। নজরুল একাডেমিকভাবে আজো উপেক্ষিত। এপারে একাডেমিক স্তর থেকে গন-মাধ্যম, রেডিও টিভি, নাটক, চলচ্চিত্র গুলোও রবীন্দ্র ইলিউশনে আক্রান্ত। বুদ্ধিজীবী, আমলা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মঞ্চ-নাটক, মিউজিক, অডিও ভিযুয়্যাল কার্যক্রমেও চলছে রবীন্দ্র সংক্রমন যা আসলে প্রকৃত মূল্যায়ন বা প্রতি তুলনাতো নয়ই, বরং সুকৌশলে নজরুলকে পিছে টেনে রেখে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো, দুই কবির ভক্তদের মাঝে বিভাজন রেখা টেনে দেয়া এবং নজরুলকে ছোট কওে, হেয় কওে দেখা ও দেখানোর অপপ্রয়াস মাত্র। তবু নজরুল বিদ্রোহের

Dhaka University Institutional Repository

কবি, বিপ্øবের কবি, শান্তির কবি, সাম্যের কবি। প্রেম-প্রীতি, হিংসা-ভালবাসা, মিলন-সংঘাতে সব কিছু মিলে নজরুল ইসলাম কবি।

১৯১৪ থেকে ১৯২৪-এর দশকে শুধু ভারত বর্ষেই নয়, প্রায় সারাবিশ্ব জুড়ে নানাবিধ তুমুল আন্দোলন, বিপ্øব ও রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া সংঘটিত হয়। এ সময়টিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্øব ও নব্য তুরস্কের আবির্ভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতবর্ষকে প্রদত্ত ব্রিটিশের নানা প্রতিশ্রুতি এবং ঐ সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ- প্রভৃতি ঘটনাবলী নজরুলকে তীব্রভাবে বিচলিত, পীড়িত ও উজ্জীবিত করেছিল। তাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরুধী ও স্বাধীনতাকমী সংগ্রাম-আন্দোলনের পটভূমিতে উদ্ভূত হয় নজরুলের সাড়া জাগানো কিছু কবিতা। তৎকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সনের ১১ই আগষ্ট নজরুলের 'ধুমকেতু' সর্বপ্রথম ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা দাবী করে। ব্রিটিশের অন্তিম যৌবনকালে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ উপমহাদেশের স্বাধীনতা-শান্ত-প্রগতির পথে এক দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যও মৈত্রীর জন্য নজরুল ছিলেন শান্তির অগ্রদূত। তিনি সারাজীবন হিন্দু-মুসলিম মিলনের জয়গাঁথা লিখেছেন-'মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু-মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমনি, হিন্দু তার প্রাণ। হিন্দু না মুসলিম ওরা জিজ্ঞাসে কোন জন্ সন্তান আপন মায়ের। আমি কেবল হিন্দু মুসলমানকে একজায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালীগালাজকে গলাগলিতে পরিনত করার চেষ্টা করেছি। দুই সম্প্রদায়ের মিলনের মিলনের জন্যে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) নেতৃবৃন্দেন আলোচনা, সভা-সম্মেলন, সন্ধি-চুক্তি, যেমন- লক্ষ্ণৌ চুক্তি ১৯১৬, ন্যাশনালপ্যাক্ট ১৯২৩, ব্যাঙ্গলপ্যাক্ট ১৯২৩, দি ইউনিটি কনফারেনস্ ১৯২৪ এবং বহু ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও রবী ঠাকুরের ভাষায় ভেতরের ন্যাজটি কাটা গেলোনা। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। জাতিগত নৃশংসতায় ও উন্মত্ততায় বিচলিত হয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই মিছিল সহ 'প্যাক্ট' 'তোবাহ', হিতেবিপরীত ইত্যাদি গানও 'মন্দির-মসজিদ' গদ্য রচনা করেন নজরুল। তিনি বলেন- 'এসভাই হিন্দু, এস ভাই মুসলিম, এস বৌদ্ধ, এস ক্রিশ্চিয়ান, আমরা সব গন্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্নতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।

যুবসমাজকে একীভূত করার লক্ষ্যে কবি গেয়েছেন- ধর্ম, বর্ন, জাতির উর্দ্ধে জাগোরে নবীন প্রাণ; তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান..। বৃহত্তর ভারতের সুস্থতার জন্যে সংঘাত বিক্ষুদ্ধ ভারতবাসীকে ঐক্যের মিলন সুত্রে গ্রথিত করার আন্তরিক প্রয়াসের কারনে শিবনারায়ণ বলেন- নজরুল একমাত্র বাঙ্গালি সাহিত্যিক যিনি হিন্দু-মুসলিম দুটি সংস্কৃতিকে পুরোপুরি আত্নস্থ করেছিলেন এবং দুয়ের উপরে উঠে হিন্দু-মুসলিম, এ দুই সংস্কৃতির সম্মিলনে সাহিত্য সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠেছিলেন। নজরুলের চেয়ে অধিকতর প্রতিভাবান হয়েও রবী ঠাকুর তা পারেননি। হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতির এক সার্থক প্রতিফলন নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্যে অন্য কোন কবি সাহিত্যিক ঘটাতে পারেননি।

ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য রচনায় নজরুল কখনো এক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। গভীর স্বজাত্যবোধ থাকলেও, তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের তাঁর চিন্তা ভাবনাকে সমুন্নত রেখেছেন। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের

মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পার্থক্য-স্বাতন্ত্র্যেও ব্যাপ্তী ঘটলেও, স্বাদেশিকতাবোধ নজরুলকে সীমায়িত করে রাখতে পারেনি। তাই কবি কাজী বলেছিলেন- আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তারা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এদেশে, এ সমাজে জন্মেছি বলেই, শুধু এদেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। কবি কাজীর রাজনৈতিক রচনার মূলে প্রথম প্রেরনা- বিশ্বজাগরন অর্থাৎ বৃহত্তর গণ আন্দোলন। তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো- জাতীয় বা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। দেশমুক্তির আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্বমানবতা জাগ্রত করার লক্ষ্যে নজরুল বলেন- জাগো অনশন, বন্দী উঠরে যতো, জগতের লাঞ্চিত ভাগ্যাহত্। কবি কাজীর মধ্যে একজন মানব দরদী, মানব হিতৈষী, সার্বজনীন মঙ্গল সাধনায় আত্নত্যাগী কবিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কবির কুমিলøা অবস্থান কালে রচিত 'প্রলয়োলøাস' (১৯২২) নামক অনন্য রাজনৈতিক কবিতার স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধই নয়- বিশ্বমানবতাবোধ- আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহা যাত্রীর মহা আনন্দের দিন। আজ মহামানবতার মহা উদ্বোধন্, এ সমগ্র মানবতার জন্য কবির আকুল উদাত্ত আহবান। নজরুলের আস্থা-শ্রদ্ধা, স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের সীমা ছাড়িয়ে সকল মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই সগর্বে তিনি ঘোষনা করেন- 'বন্ধু বলিনি জুট, এইখানে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট, এই হৃদয়, সেই নিশাচল, কাশী, মথুয়া, বৃন্দাবন, বুদ্ধগয়া- এ জেরুজালেম, এ মদিনা-কাবা ভবন। মন্দির এই, মসজিদ এই, গীর্জ্জা এই হৃদয়।

মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও বিদ্বেষ-বিশৃঙ্খলার প্রাচীর ভেঙ্গে নব অভিযানের জন্যে- জাতের নামে বজ্জাতি, জ্বাল-জালিয়াত খেলছে জুয়া, ছোলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া। হুঁকুর জল, আর ভাতের হাড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ। তাই তো বেকুব, করলি তোরা একজাতিকে একশোখান। মুসলমান বিজাতীয় সেবাদাসদের হুঁশিয়ার করে নজরুল বলেন- আনোয়ার! আনোয়ার! কে বলে সে মুসলিম, জিভ ধরে টানো তার; বে-ঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচাতে তার। আত্ন-বিস্মৃত সংকীর্নতার প্রাচীর ভেঙ্গে মানবতাকে সুসংহত করার কি উদাত্ত আহবান!

নজরুল একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার, সাংবাদিক, পত্রিকা পরিচালক, সম্পাদক, সৈনিক, বিদ্রোহী, উপন্যাসিক ও শিশু-সাহিত্যিক। নাট্য সাহিত্যেও নজরুলের রয়েছে প্রশংসনীয় অবদান। বাংলার নাট্য জগতে নজরুলকে পাওয়া যাবে পৃষ্ঠপোষক, নির্দেশক, রচয়িতা, সংগঠক, অভিনেতা, উদ্যোক্তা, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসাবে। ১৯১৪ সনে দরিরামপুর হাইস্কুলে শাহজাহান নাটকে আল মসিরের ভূমিকায় এবং ১৯২১ সালে কুমিলøার কান্দিরপারে সীতার বনবাস নাটকে রামের চরিত্রে প্রাণমাতানো অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন নজরুল। নিজের রচিত ৪৮ টি নাটক ছাড়াও চুরাশিটি নাটক ও নাট্যকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। ব্যাপক গভীর ও সৎ অনুসন্ধান নজরুলের রত্নসম্ভারকে বিস্মৃতি, লুপ্ত ও গুপ্তাবস্থা থেকে উদ্ধারের সহায়তা করবে। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনমথ রায়ের নিম্নে উৎকালিত উদৃতি থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে নজুরুল কতো মহীয়ান- যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার মহুয়ার কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন; এবারও আমার কারাগার এর জন্য গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হননি, পরমোলøাসে উহাতেও স্বয়ং সুর যোজনা করিয়াছেন। সাবিত্রীর পরম

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ হয়েছে তাঁর গান। লিখিতে গর্বে ও গৌরবে আমার বুক ভরিয়া উঠে। নাট্যকার হিসাবে কতো স্বচ্ছ, মূল্যবান স্বীকাসোক্তি।

ঐতিহাসিক নাটক সিরাজউদ্দৌলার জন্য লিখিত নজরুলের গান আজো মানুষের চোখের কোনে পানি এনে দেয় ও বদনে বিষাদের আলো ফেলে-

ক) পথহারা পাখি কেঁদে ফিরিয়া একা

আমার জীবনে শুধু আঁধারের লেখা।

ঊাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে-

আশ্রয় যাচি কাহার কাছে,

বুঝি দুঃখ নিশি মোর, হবেনা ভোর,

ফুটিবেনা আশার আলোক রেখা।

খ) নদীর একুল ভেঙ্গে, ও কুল গড়ে,

এইতো নদীর খেলা-

সকাল বেলায় আমিররে ভাই,

ফকির সন্ধ্যাবেলা- এইতো নদীর খেলা।

কি অব্যক্ত বেদনা ফুটে উঠেছে প্রতিটি চরনে। তারপরও দুর্মূখরা কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মৃত কবি বলে নিচ মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অবাক জ্যোতিষ্ক একজন অসন্য শিল্পী। তিনি ছিলেন অপরিসীম প্রাণের স্ফুর্তিতে ভরপুর। তাঁর প্রতিটি মূহুর্ত ছিল দুরন্ত আবেগে টলমল। সকলের থেকে দুরে সরে গিয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে একাগ্রমনে শান্ত, সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হতে পারেননি তিনি। ভিড়ের মধ্যে আসর জমিয়ে, হৈ-হুলেøাড় করে পান-সুপুরির কৌটা খুলে গাল-গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখেছেন অনেক অসাধারন কবিতা, এক একটি আশ্চর্য্য স্মরনীয় গান। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর মন্তব্য করেছেন- মাত্র আধঘন্টা, কি আরো কম সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছয়খানি গান লিখে পাঁচ ছয়জনের হাতে বিলি করে দিতেন, যেন মাথার মধ্যে গানগুলো সাজানোই ছিল, কাগজ কলম নিয়ে সে গুলো লিখে ফেলতে যা দেরী।, সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে পাঁচ-ছয় জনকে সেই গান শিখিয়ে দিয়ে রেহাই দিতেন তিনি..।

রবী ঠাকুরের পরে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রতিভসম্পন্ন মৌলিক কবি। তিনি ছিলেন অবিরাম সৃষ্টিশীল। সৃষ্টির আনন্দ তাঁর মাঝে ছিল অপরিসীম। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিড়ম্বনা ও ভর্ৎসনার কুটজালে আটকে পড়ে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় দিশেহারা হলেও আমরা তাঁকে যেভাবে কল্পনা করি, যে ভাবে খুঁজি, যেভাবে পেতে চাই, ঠিক সেভাবেই আমরা তাঁকে পাই। নিজের তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর সমতুল্য এমন সর্বতোমুখী, স্বতোজ্জ্বল প্রতিভা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল। কোন একক গীতিকার নজরুলের মতো এত অধিক সংখ্যক গান রচনা করতে পারেন নি। নজরুলের সঙ্গীত সৃষ্টির কাল খুবই স্বল্প। অদ্যাবধি গবেষনায় প্রাপ্ত তাঁর গানের সংখ্যা চারি হাজার আটষট্টিটি। এছাড়াও হিন্দু ধর্ম মাহাত্ন বিষয়ক কালী-দর্গা-শ্যামা-বাবু-ভক্তি গীতির সংখ্যা পাঁচশত চলিøশটি। বানী, সুর এবং রাগ-বৈচিত্র্যেও উপমহাদেশের বাংলা সঙ্গীত জগতে নজরুল সঙ্গীত এক বিচিত্র রত্ন ভান্ডার। গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে অতি সার্থক ভাবে দান করেছেন । তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টিই হলো তাঁর গান। রবী ঠাকুরের যাবতীয় গান গীতিবিতান গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। তাঁর স্বরলিপি, সুরবিতান, মুদ্রিত আছে। তদুপরি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড, কবির বানী ও তার নির্ভূলতা নিরূপনের কাজে সর্বক্ষন ব্যাপৃত রয়েছে। অপর পক্ষে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অধিক সংখ্যক গানের রচয়িতা হলেও, কবি নজরুল ও তার গানের সংরক্ষন ও চর্চার কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নজরুল একাডেমী, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, হিন্দোল সঙ্গীত একাডেমী, সরকারী সঙ্গীত বিদ্যালয়, দোলন চাঁপা সঙ্গীত নিকেতন, অগ্নিবীনা সঙ্গীতায়ন প্রভৃতি সংস্থাও পারস্পরিক মতানৈক্যের টানাপোড়েনেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে কোন সুশৃঙ্খল সমন্বিত ব্যাবস্থা নিতে পারছেনা বা নেয়া হচ্ছেনা। উলেøখিত কারনে, একাডেমীক নজরুল চর্চাও পদ্ধতিগত নজরুল গবেষনার তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হচ্ছেনা। তাছাড়া নজরুলের সঙ্গীত সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি ছিল চিৎপুর-কলকাতায়। ১৯৭২ সালে ঢাকায় নজরুলকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল মাত্র। আজকাল ব্যবসায়িক মনেবৃত্তির কারনে ওপার থেকে নজরুলের সবকিছু তচনচ হয়ে, উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে এপারে এসে ভিড়ে। সংকীর্ন মানসিকতা ও বিদ্বেষের কারনে ব্যঙ্গভরে তারা আধুনিক মানুষের রুচির উপযোগী করে এপারে পাঠাচ্ছে নজরুলের গান। গানের আদি স্রষ্টার রুচি-মানসিকতা ও যুগলক্ষনের তোয়াক্কা না করে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে সব করছে তারা। কবির রচনা অনেকে হুবহু নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন।

বাংলা সঙ্গীত জগতের দিকপাল- বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, রজনীকান্ত, রামপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবী ঠাকুরের সমান্তরাল প্রতিভাও যশের দাবীদার হলেন সঙ্গীত ও গীতিকার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিচিত্র প্রতিভার অপূর্ব সমাবেশ ছিল তাঁর মধ্যে। তাই নজরুল সঙ্গীত বঙ্গ সংস্কৃতি জগতের এক উলেøখযোগ্য গৌরবময় সম্পদ। নজরুল সঙ্গীতের বৈচিত্র্যে, সুরে ও বানীর আকর্ষনে ওপার বাংলার অনেক শিল্পীই অব্যাহত অনুশীলনের মাধ্যমে ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠার শীর্ষে আরোহন করে আমাদের প্রাণপ্রিয় কবিও কবি প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিলেও, হীনমন্যতা ও স্বীয় সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাব হেতু আমাদেও শিল্পজগতে এমনকি আমাদের মাঝে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল যথাযথভাবে অনুশীলিত হচ্ছেনা। হিন্দু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীরা নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে তাদের ধর্মীয় গীতি গাইলেও মুসলিম রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক গীতি পরিবেশেন করেন কিন্তু নজরুলের হামদ, নাত ও গজল গেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হতে চান না। নজরুল

প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন। তৎসম ও তদ্ভব ভাষায় সুপন্ডিতদের অবোধ্যও দুর্বোধ্য সংস্কৃত কন্টকিত সাহিত্যকে এড়িয়ে গিয়ে, মুসলমানের যে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট আছে, তার আচার অনুষ্ঠান-উৎসব, সাহিত্য-সঙ্গীত- ভাষার যে পৃথক রূপে বৈশিষ্ট আছে, নজরুল তা তাঁর নতুন সৃষ্টির সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন। আরব-ইরান-তুরানের সুর অনুরনিত হলো তার জাগরনধর্মী ইসলামী গান-গজল-কাওয়ালী-মারফতি-মুর্শিদী-হামদ-নাতে। তাইতো ১৯২৯ সালের জাতীয় কবির সম্বর্ধনার মাতপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল- তুমি বাংলার শ্যাম-কুয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ। তাছাড়া কবি কাজীর সাহিত্য চর্চার পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই মাত্র ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নজরুল রবী ঠাকুরের স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯২৩ সনে জেলখানায় নজরুলের অনশনের খবর পেয়ে আসামের শিলং থেকে রবী ঠাকুর টেলিগ্রাম করেন- ‘অনশন ভঙ্গ করো । আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়।’ নজরুলের দীপ্তময় ভূবনের আলোকছটা দেখে রবী ঠাকুর বিস্মিত হয়েছিলেন। নজরুল বলেছিলেন- বিশ্ব কাব্য লক্ষ্মীর একটি মুসলমানি ঢং আছে। ও সাজে তার শ্রীহানি হয়না। মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি ভিন্নতর রূপ আছে বলেই তাঁর রূপ-প্রতীক-উষাময় আমরা দেখি চাঁদ-মিতিরা, গোলাপ-নার্গিস-সাকী-সরাব, লাইলী-মজনু; শিরি-ফরহাদ। তাতে প্রতিবিম্ব হয় নবী পয়গম্বও, ইব্রাহীম-ইয়াকুব-ঈসা-মুসা, দিগ্বীজয়ী বীর খালেদ-তারিক-মুছা; রাজনৈতিক মনীষী- কামাল, আনোয়ার, আব্দুলøাহ, পাহলভী, হারুনুর রশীদ, জগলুল পাশা। মুসলিম বিদুষী নারী ফাতিমা, হাজেরা, আয়িশা, মরিয়ম, নুরজাহান, মমতাজ, চাঁদসুলতানা, রাজীয়ারা ভিড় জমায়েছে কবি কাজীর লেখায়। ইরান, তুরান, হিন্দ, বোখারা, সমরকন্দ, আন্দালোশিয়া, স্পেন, কর্ডোভা; আর রুমী, জামী, সাদী, হাফিজ, উমর খৈয়াম, খলদুন তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে ভেসে উঠেছে। এমনিভাবে নজরুল আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাতীয় আশা-আকাঙ্খার সার্থক শিল্পরূপ দিয়ে অমরত্ব দান করেছেন।

রবীঠাকুর ১৯২৩ সালে তাঁর গীতিনাট্য ‘বসন্ত’ উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছিলেন- উৎসর্গ শ্রীমান কবি কাজী নজরুল স্নেহভাজনেষু, ১০ই ফাল্গুন, ১৯২৯ বাংলা। উৎসর্গ পত্রে কবি শব্দটির প্রয়োগ রবী ঠাকুর সচেতনভাবেই করেছিলেন। রবী ঠাকুর যাকে কবি বলেছিলেন তাঁকে মহাপদ্যকার বলা অপরাধ। রবী ঠাকুর বলেন- আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষন করছো। আর পড়ে থাকলেও, তার রূপ ও রসের সন্ধান পাওনি। অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র। নজরুল আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির দিশারী। মোহিত লাল মজুমদার নজরুলের খেয়াপারের তরনী পড়ে বলেছিলেন- বহুদিন কবিতা পড়িয়া এতো আনন্দ পাইনাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। রবী ঠাকুর জোড়াসাঁকোতে নিজে নজরুলের মুখে তাঁর বিদ্রোহী কবিতার আবৃত্তি শুনে তাঁকে আলিঙ্গল করে বলেছিলেন-হ্যাঁ কাজী , তুমি আমাকে হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমাম কবি প্রতিভায় জগত আলোকিত হবে। রবী ঠাকুরের প্রখর প্রতিভার পূর্ণ প্রভাবের যুগটাতে নজরুল কলম ধরেন। নজরুলের লেখায় বাংলা কাব্য লক্ষ্মীর মুসলমানি ঢং দেখে তৎসম ও তদ্ভব ভাষার যুগপন্ডিতরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। রবীন্দ্র মন্ত্র গন্ডির মোহাচ্ছন্ন আবেশে আবর্তিত না হয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অবস্থান করে নজরুল সাহিত্য সাধনা করে রবী ঠাকুরের মায়াজালকে ভঙ্গ করে ফেলেন। তাই রবী ঠাকুর কবি

কাজীকে উদ্দেশ্য করে লিখেন- আয়, চলে আয়রে ধুমকেতু! আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু। দুর্দিনের এ দুর্গ শিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।

আশি বৎসরের জীবন কালে পয়ষট্টি বৎসর জোড়াসাঁকোর জমিদার বাড়ীর শান্ত সমাহিত জাঁকালো পরিবেশে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করে ভারতের ভাগ্য বিধাতা ব্রিটিশদের দেয়া নাইট উপাধিধারী রবীঠাকুর যা করতে পারেননি, সামরিক বাহিনীর লোক হয়ে, ব্রিটিশ সিংহের নখরের বারংবার আঁছড় খেয়ে, ফেরারী হয়ে রাজ দ্রোহীতার দায়ে কারাদন্ড ভোগ করেও নজরুলের ধুমকেতু সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতার দাবী করে এবং নজরুল বিজয় দুন্দুভি বাজিয়ে বিশ্বের নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের বেদনাপøুত হৃগয়বীনার ঝংকার দিয়ে গেয়েছিলেন-'জাগো ! অনশন বন্দী উঠরে যতো, জগতের লাঞ্চিত ভাগ্যাহত। এটি বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলমুক্ত মানুষের শান্তিময় এবং সম্প্রীতি দীপ্ত মানব জীবন প্রতিষ্ঠার মহা আহবান। অন্য কারো সৃষ্টিতে এমনটি পরিদৃষ্ট হয়না। তাই রবী ঠাকুর, অমীয় চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাস ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম- প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাহিত্য ভূবনে, প্রত্যেকে প্রজ্ঞা, মনীষা ও জনপ্রীয়তায় স্বকীয়। সাহিত্য-সৃষ্টির বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যের ক্ষেত্রে এমনটি না হলেও নজরুলকে বিচার করতে গেলেই কাব্যও সঙ্গীতের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচরন বা ধর্মীয় মূল্যবোধ; তাহয়ে যায় সম্প্রদায়ও রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট।

১৯২৯ সনের ১৫ই ডিসেম্বও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবী ঠাকুরের বিদ্যমানতায় অবিভক্ত বাঙ্গালি জাতি তথা বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কলকাতার আলবার্ট হলে বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুলø চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যারিষ্টার এস ওয়াজেদ আলীও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাহিত্য অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবগের্র সমাবেশে রবী ঠাকুরের স্নেহভাজন অনুজ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। জাতীয় কবি হিসাবে বরণ করে নেবার লক্ষ্যে বিভিন্নস্তরের হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে যে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, সেখানে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে পসিদ্ধ গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য গেয়েছিলেন নজরুলের লেখা- 'চল চল.. উর্দ্ধ গগনে বাজে্ নিন্মে উতলা ধরনী তল'' নজরুলের উদ্দেশ্যে দেয়া অভিনন্দন পত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল স্মরনীয় কটি পংক্তি '' তোমার অসাধারন প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙ্গালি জাতিকে চির ঋনী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত অভিনন্দন প্রহন হরো। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, তুমি চিরঞ্জীব।, তুমি বাঙ্গালীর ক্ষীন কণ্ঠে তেজ দিয়াছ।, তোমার কবিতা বিচার-বিশেøষনের উর্দ্ধে। '' সম্বর্ধনা সভায়-সভাপতি বরেন্য বিজ্ঞানী স্যার আচার্য প্রফুলø চন্দ্র রায় বলেন-'' নজরুল শুধু মুসলমানের কবি নন্। তিনি বাংলার কবি্, বাঙ্গলির কবি্।, হিন্দু- মুসলিম মিলে বাঙ্গালি্। আজ নজরুলকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন্।'' তাই সেই ১৯২৯ সাল থেকে গন-মনে কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি হিসাবে আদৃত হয়ে আসছেন।

তারপরও নজরুল বিরোধিরা তাঁর লেখায় অশøীলতার গন্ধ পেয়ে নাসিকা কুন্ঠিত করতো। কবিকে 'আড়ি চাচা বলতো' তাঁর কবিতাকে 'চক্কুখান সামা' আর ফেকু উস্তাগারের কথা বলে ব্যঙ্গ করতো। তিনি প্রতিভাবান

Dhaka University Institutional Repository

বালকের মতো আজীবন লেখে গেছেনৃতাঁর বিপুল সৃষ্টির সামান্য অংশই উৎকৃষ্ট কবিতা ৃ তিনি চারন কবিৃতিনি সর্বদা কবি ননৃ। তিনি ভাসমান বাস্তুহারা ৃ। তিনি একজন মহাপদ্যকার ৃ। তিনি বিদগ্ধ কবি ননৃ। তিনি সার্বজনীন কবি ননৃ ।ৃ তিনি একটি যুগের কবিৃ।ৃ তিনি শেøাগানের কবিৃ।ৃ পার্শি শব্দে কবিতা লেখে এ পাত নেড়ে ৃ কিছুকাল পরে শেøাগানের ভাষার জন্যও কেউ নজরুলকে সন্ধান করবেনাৃ।ৃ তাঁর লেখায় হৈ চৈ বেশী, কবিত্ব নেইৃ ।ৃ তিনি খন্ডিত কবিৃ। তার ইসলামী গানের আবেদন এবাংলা থাকলেও পশ্চিম বাংলায় তা অনুপস্থিতৃ। শ্যামা সঙ্গীত পশ্চিমবঙ্গে থাকলেও এ বাংলায় তার আবেদন নেইৃ।ৃ নজরুল উভয় বাংলায় সমাদৃত নন।ৃ তিনি আবেগ প্রবন, তাই শব্দ প্রয়োগে সতর্ক ননৃ ।ৃ অভিনয়ের সঙ্গে কন্ঠ দান করলেও তিনি মৃত কবি, ইত্যাকার বেসুমার অভিযোগ নজরুলের বিরোদ্ধে। নজরুলের শব্দ ব্যবহার কৌশল তাঁর নিজের। তিনি নিজের স্বপ্ন নিজে দেখেছেন এবং নিজ হস্তে তার কাব্যরূপ দান করেছেন। কারো মোহে আবিষ্ট হননি। পুচ্ছধারিতা বা অনুকরন প্রিয়তা নজরুলের মধ্যে অনুপস্থিত। তিনি বলতেন- তুই নিভ্স্র কর আপনার পর, আপন পতাকা কাধে তুলে ধরৃ। তাই নিজেই ভাঙ্গা কিলøায় বিজয় ঝান্ডা উড়িয়েছেন নিজ হাতে।

নজরুলকে ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বগোত্রীয়রাও কম যাননি। ‘ইসলাম দর্পন’, ‘মোহাম্মদী’, ‘মুসলেম দর্শন’ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা নজরুলের বিস্তর বিরূপ সমালোচনা করতো। কেউ কেউ বলতেন- ‘লোকটি ধর্মজ্ঞান হীন বুনোবব্বর’, ‘দেব-দেবীর নাম মুখে আনে, সনে দাও পাজিটার জাতমেরে’, ‘লোকটা মুসলমান, না শয়তান’..‘তাঁর মুন্ডপাত হওয়া উচিত’.. ‘সে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে, ছেলেদের নাম হিন্দু নাম রেখেছে’.. ‘হিন্দু দেবী কালী, দুর্গাকে নিয়ে কতোই না কবিতা লিখেছে..। পাঁচ শত চলিøশটির অধিক ভজ্জন-কীর্তন-বাবু-ভক্তি গীতি রচনা করে নজরুল শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা হয়েছেন। তাঁর লেখনিতে ‘মৃত্যুক্ষুধায়’ খৃষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য বর্নিত হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক উদ্বাস্তু..। তিনি পুরোপুরি মুসলমান কিনা তাও প্রশ্ন উঠেছিল। আশালতা সেন গুপ্তা ওরফে প্রমিলা নজরুলের মৃত্যুর পর তার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী কবর দেয়া হলেও, নজরুল তাঁর স্বগৃহ পরিবেশ হিন্দুত্ব মুক্ত করতে পারেরনি কারন প্রমিলা নজরুলের মা গিরিবালা দেবী, যিনি রক্ষনশীল হিন্দু ঘরের বিধাব মহিলা স্বীয় সমাজকে উপেক্ষা করে একদিন হাত ধরে প্রতিভাবান বাঁধনহারা কবির সঙ্গে গা ভাসিয়ে ছিলেন। হিন্দু কন্যা প্রমিলাকে বিয়ে করায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বর্ণবাদী হিন্দু নেতা, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, জমিদার, স্বদেশী নেতারাও নজরুলের বিরুদ্ধে তেড়ে আসেন। তাঁকে আক্রমন করার জন্য প্রকাশিত হয় শনিবারের চিঠি। মোহিত লাল মজুমদার বলেন-‘ আমি ব্রাক্ষ্মন। দিব্য চক্ষে দুর্গতি হেরি তোর; অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওরে জাতি চোর..”। এমনকি করে কবিকে হিংসার খড়গহস্ত ও লেখনি সর্বদিক থেকে বারংবার আঘাত হেনেছে। হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে, শ্যামা সঙ্গীত লিখেও, তিনি যে মুসলমান, সে পরিচয় লুকাতে পারেননি।

নজরুলের প্রথম কবিতার বই ‘অগ্নিবীনা’ ও প্রথম প্রবন্ধের বই ‘যুগবানী’ ১৯২২ সনে প্রকাশিত হলে, ভারত সরকার ‘যুগবানী’ গ্রন্থখানা নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করেন। অগ্নিবীনা নিষিদ্ধ না হলেও তার কোন সংকলন কোথাও পাওয়া গেলে আটে্ক ফেলা হতো। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আদি পুরুষ আদম থেকেই মানুষের লোভ বেশী। তাছাড়া, যুব মন নতুন কিছু দেখলে আকৃষ্ট হয়। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার আগুন ঝরা প্রতিটি ছত্রই তখন

উতলা ধরনীর অশান্ত তরুন যুবাদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে ছুটলো দেশের আনাচে কানাচে। পুলিশ-গোয়েন্দা-আমলারা বেসামাল হয়ে পড়লো। ১৯২২ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর ধুমকেতু পত্রিকায় ' আনন্দময়ীর আগমনে' ও ' বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' সম্পাদনার দায়ে ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪-ক ধারা মোতাবেক কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'রাজদ্রোহী' হিসাবে অভিযুক্ত হলেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় দর্গাপূজার ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্যের উপর রাজনৈতিক চেতনা আরোপ কওে নজরুল লিখেছিলেন- 'আর কতো কাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূত্তির আড়াল; দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি; ভূ-ভারত আজ কসাই খানা, আসবি কখন সর্বনাশী।

ধুমকেতু ও নবযুগ পত্রিকার জামানত সহ প্রতিটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হলো। তারপর অন্যান্য পত্র-পত্রিকা-সাময়িকী -যে গুলোর সংগে নজরুলের সম্পৃক্ততা ছিল, বাজেয়াপ্ত করা হল। নজরুলের নামে জারি হলো গ্রেফতারি পরোয়ানা, নজরুল গা ঢাকা দিলেন। এসময় জনৈক আলী আকবর খাঁনের সঙ্গে কুমিলøার দৌলতপুরে বেড়াতে এলেন নজরুল। সেখানে আলী আকবর খাঁনের ভাগ্নি সৈয়দা খানম ওরফে নার্গিস আরা খানমের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয়। পারিবারিক কারনে এ বিয়েটা টিকেনি। এ বিবাহ বিচ্ছেদের অব্যাবহিত পরেই কুমিলøার কান্দিরপাড়ে অবস্থানরত মানিকাগঞ্জের 'তেওড়া' গ্রামের আশালতা সেন গুপ্তা ওরুফে প্রমিলার সঙ্গে নজরুলের দ্বিতীয় বিবাহ হয়।

গা ঢাকা অবস্থায় কুমিলøা থেকে নজরুলকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে আলীপুর জেলে এবং পরে ওখান থেকে হাওড়া জেলে নীত হন নজরুল। ১৯২৩ সনের জানুয়ারী মাসে বিচারে নজরুলের সশ্রম কারাদন্ড হলো। নজরুল কারারুদ্ধ হলেন বটে, তাঁর স্বাধীনতার অভিযান, সাম্যও মানবতার অভিযানে কোন বিরতি ঘটেনি। কারান্তরালে নজরুল লিখলেন 'রাজবন্দিও জবান বন্দী'। রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদন্ড প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা বই-পত্র-পত্রিকা-সাময়িকী নিষিদ্ধ হলো এবং বাজেয়াপ্ত করা হলো। প্রবঞ্চিত, নিপীড়িত, স্বাধীনতা হারা মানুষ তথা ভারতকে জাগাতে ব্রিটিশ রাজের কোপানলে পড়ে নজরুলই প্রথম বাঙ্গালি লেখক যিনি সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ সনের ১৬ই ডিসেম্বও নজরুল কারামুক্ত হলেন। এমনি করে অপঘাত, নির্যাতন ও দুঃখের মধ্যে দিয়ে দুখুমিঞার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এরই মধ্যে তাঁর জন্মদায়িনী দুঃখিনী মায়ের মৃত্যু ঘটে। চার বৎসরের শিশুপুত্র বুলবুলকে হারালেন তিনি। জীবন সঙ্গিনী প্রমিলা পক্ষপাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরিবারের বিরহ ব্যথা, অপর দিকে সংসারের দুঃসহ অভাব-অনটন এবং রাজনৈতিক নির্যাতন কবিকে অস্থির করে তুলে। পাকিস্তান কায়েমের পর কবি পরিবার জীবন ধারনের মৌলিক প্রয়োজন- তথা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার জন্য পাকিস্তানে আসতে চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকারের উদাসিনতা এবং পরে ভারত সরকারের কবিকে পাকিস্তানে না পাঠানোর প্রচেষ্টা নজরুল পরিবারবে ভীষন বিপাকে ফেলে। কবির জীবনে দুর্ভাগ্য অনেক গভীর। রাজনৈতিক নির্যাতন ও সামজিক অপপ্রচার তথা বহিরাঙ্গনের কথা ছেড়ে দিলেও কবির পারিবারিক জীবনেও ছিল সীমাহীন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। হিন্দু শাশুড়ীর দাপটে পরিবারে মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান না করতে পারার বিড়ম্বনা, গোড়াপন্থীদের চোখ রাঙ্গানি, অসুস্থাবস্থায় কবির প্রতি তাঁর বন্ধুও পরিচিত জনের অবহেলা, নোংড়া, আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে রোগগ্রস্থ কবির দুঃসহ জীবন যাপন

কবিকে অস্থির করে তুলে। এর কিছু দিন পর নানা টানা-পোড়েনে ব্যাথিত ও উপেক্ষিত কবি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ভারত সরকার তখন চিকিৎসার জন্য কবিকে রাঁচি হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ১৯৫০ সনের ১০ই মে কবি নজরুল ও প্রমিলাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লন্ডনে পাঠানো হয় এবং ঐ বৎসরের ১৪ই ডিসেম্বর কবি দম্পতি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৬০ সনের ৩০শে জুন প্রমিলা নজরুল দেহ ত্যাগ করেন।

নজরুল প্রিয়জন হারিয়ে দীর্ঘদিন কলকাতায় রোগগ্রস্থ অবস্থায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। অবশেষে ১৯৭২ সনের ২৪শে মে/১০জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আশা হয়। কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান হয় এবং ঢাকার ধানমন্ডিতে কবিভবনে তার বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার '২১শে স্বর্ণ পদক এবং ১৯৭৪ সনের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন। দুর্মুখদের বিরোধের কারনে তাঁর প্রতিভার বিলম্বিত স্বীকৃতি এলো। ব্রিটিশ ভারতে সমকালীন মেজাজও চাহিদার নিরিখে নজরুল তাঁর রচনায়-কবিতায়-গানে-ভাষনে আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার সার্থক শিল্পরূপ দান করে 'বাংলাদেশ' নামের বর্তমান সার্বভৌম সত্তাসম্পন্ন জনপদটির স্বাধীন অস্তিত্বের সাংস্কৃতিক অবকাঠামো বিনির্মান করেন। তিনি আমাদের স্বতন্ত্র্য জাতি প্রতিষ্ঠার অগ্রসৈনিক। তাই আজ আমরা একটি স্বাধীন জাতি। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি অতি জনপ্রিয় নাম। জাতির হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন বলেই তাঁর অবিস্মরনীয় স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখার লক্ষ্যে তাঁকে 'জাতীয় কবি'-র অভিধায় বিভূষিত করা হয়েছে। এ সম্মান প্রদর্শন তাঁকে বড় করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, এ স্বীকৃতি আমাদের জাতিকে বড় করেছে, সম্মানিত করেছে। তাই জাতীয় পর্যায়ে অন্য যেকোন কবি থেকে নজরুলের মর্যাদা বেশী। কাজেই তাঁর জন্ম-মৃত্যু জার্ষীকী জাতীয় অনুষ্ঠানের সমতুল্য। এর সঙ্গে অন্য কারো কোন অনুষ্ঠানকে টেনে আনা অনুচিত। পরাধীন জাতি যেভাবে নজরুল সঙ্গীতের উন্মাদনায় একদা উদ্বেল হয়ে জেগে উঠেছিল, তেমনি আজো স্বাধীন জাতির পরিপূর্ণ বিকাশে নজরুলের সম্যক পরিচিাত, সঠিক মূল্যায়ন ও সঙ্গীতের উদ্দীপনা নব শক্তির সঞ্চার করবে এবং বিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ও এদেশীয় ঐতিহ্য-বিরোধী তৎপরতা এবং বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো ওপারের গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাহিত্যিক, নৃত্যশীল্পীর অবাধ অযাচিত আগমন, তথা বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবিলায় খাপছাড়া তলোয়ারের মতো জ্বলে্সে উঠে সঠিক নির্দেশনা দান করবে। নজরুলের স্মৃতি, জীবন ও সাহিত্যের উপর গবেষনা, কবির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রচনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষন, প্রকাশনাও প্রচার-তথা, সামগ্রিকভাবে নজরুল চর্চার উদ্দেশ্যে কবির অমর স্মৃতিবাহী ধানমন্ডির 'কবিভবনে' নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৫ সনের ফেব্রুয়ারীতে। নজরুল ইনস্টিটিউট, নজরুল ইনস্টিটিউট ট্রাস্টি বোর্ড-এ ডক্টরেট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেই নজরুল বিষয়ক কাজ কর্মের পূরো দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচিন নয়। নজরুলকে চর্চা করতে গেলেই ইসলামী ঐতিহ্যও সংস্কৃতিকে মেনে নিতে হয় বলেই অনেক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তথাকথিত বচন বাগীষ বুদ্ধিজীবীরা মন খুলে কাজ করতে পারেনা। দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতা-বিবৃতি অনেক সময় মূল লক্ষ্যকে ব্যাহত করে বিভ্রান্তি ছড়ায়। তাই নজরুল চর্চার আঙ্গিনায় আজোও যথেষ্ট অন্তরায়ও দুঃখজনক দিক রয়েছে। নজরুল বিষয়ক কাজের প্রতি ভক্তি, আনুগত্য, প্রাণের টান, অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে- কোন সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে নয়- এসব সংস্থার কর্নধার নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে। নজরুল বিষয়ক গঠনমূলক কাজে কোন বিদ্বেষ-অনীহা নেই বা অন্তরায় নহেন, এরূপ ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্বই জাতির কাম্য। অন্যথায়, এ মহান কর্তব্য ব্যাহত ও বাধাগ্রস্থ হবে। জাতীয় কবির পাশে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাংবাদিক ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রাপ্তদের যেমন, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ এবং কবির সহচর লুৎফুর রহমান, কবি মোজাম্মেল হক, কমরেড মোজাফ্ফর আহম্মেদ, আব্দুল কাদির, খাঁন মঈন উদ্দীন, আবুল মনসুর আহমেদ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, সিকান্দার আবু জাফর-এর ছবিগুলো থাকলেই একাডেমীতে রবী ঠাকুরের ছবি প্রতিস্থাপনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হতো।

একাডেমীক নজরুল চর্চা ও পদ্ধতিগত নজরুল গবেষনার দায়িত্ব নিয়ে এগীয়ে আসতে হবে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষকদের এবং আমাদের গণ-প্রচার মাধ্যম, একাডেমী, মহত সংস্থাগুলোকে। জাতীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কালে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান জাতীয় অনুষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানমালার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে। পুরস্কৃত করতে হবে নজরুল গবেষকদের- যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কবিতীর্থ চুরুলীয়ার নজরুল একাডেমী নজরুল বিষয়ক কাজের জন্য এপার বাংলার কবি আব্দুল কাদির, কবি তালিব হোসেন, সোহরাব হোসেন, নিতাই ঘটক, জগত ঘোটক, ধীরেন্দ্র মিত্র, ডঃ রফিকুল ইসলাম, শেখ লুৎফুর রহমান, সাহাবুদ্দিন ও ফেরদৌসী রহমানকে নজরুল পদক প্রদান করেছেন।

আমাদের সরকারী অনুদান পুষ্ট সংস্থা-প্রতিষ্ঠান গুলোকে বা এব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এপার বাংলার মানুষ যে ত্যাগ-তিতিক্ষা-আন্দোলন-সংগ্রামের অম্øান নজীর স্থাপন করেছে, এদেশের ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক-গবেষকদের ঢাকাকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী মনে করে দেশজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দান করে নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা, সাধনা ও শ্রমদান করে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদকে মজবুত করতে হবে। প্রাক-মুসলিম আমলে ব্রাক্ষ্মন্য সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটবে বলে দেশীয় ভাষা চর্চা পাপ বলে ধারনা করা হলেও গোটা মধ্যযুগ ব্যাপী মুসলমান বাদশাহ-সুলতান-নবাবরা নিজস্ব রাজভাষা ফার্সি থাকা সত্বেও ব্যাপক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে বাংলা সাহিত্যের মজবুত ভিত্তি সৃজন করেছিলেন। তাই দীনেশচন্দ্র সেন বলেন- মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এদেশে বাংলা ভাষার বিকাশ সম্ভব হতো না। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত শ্রেষ্ঠরাগ রচিত হবে এ দেশেই। শিক্ষাকৃষ্টিতে অগ্রসর পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বাংলা ভাষার গৌরবময় স্বকীয়তায় সচেতনতার অভাব প্রদর্শন করলো যখন পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ১৯৬৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী ভোটের মাধ্যমে মায়ের জবানকে আটকে দিয়ে, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করলো। হিন্দির দৌরাত্ম্যে বাংলা ভাষার ভবিষ্যত নিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বেজায় উদ্বিগ্ন। হিন্দির একচ্ছত্র দাপটে তাদের বাংলা-ভাষা-সংস্কৃতি দিনকে দিন কুঁকড়ে যাচ্ছে। এখন তারা অখন্ড ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভূক্ত। তারা দুরদর্শনে কি দেখবে এবং বেতারে কী শুনবে তা নিভ্বর করছে দিলিøর মজ্বির উপর। তার সীমান্তের ওপারে চোখ ফেলে নয়। পুচ্ছধারীও চর্বিত চর্বণ করে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। অনুকরনপ্রিয়তা নিজের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রাখে। বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস-আচরন-চেতনা-স্পৃহাকে অবলম্বন করেই বাংলাদেশের মানুষের ভাষার প্রকৃতি ও অর্থবোধ গড়ে

উঠেঠে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে সাড়ম্বরে বেঁচে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব এদিককার কারো কারো চোখের ধাঁধাঁ। এক কালের ইংরেজ উপনিবেশ আমেরিকায় আমেরিকান ইংরেজী গড়ে উঠেছে, অবিকল ইংলেন্ডের ইংরেজী নয়। ইংলেন্ডের রাজা-রানীরা আজও কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সাংবিধানিক প্রতীকী প্রধান রয়েছেন। ওসব দেশগুলোতে ভৌগলিক সীমায় অবস্থানরত অধিবাসীরা ইংরেজী ভাষাভাষী হলেও, তাদের চেতনা-স্পৃহা ও আশা-আকাঙ্খাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে স্ব-স্ব দেশের ইংরেজী ভাষা। আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা ইংরেজী ভাষী হলেও বিশ্বনন্দিত ইংরেজ কবি উইলিয়াম সক্সপীয়ার তাদের কারো মহাকবি বা জতীয় কবি নন। এমনকি মার্কিনীরা কোন কোন শব্দের বানানও উচ্চারন ক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের থেকে পার্থক্য রক্ষা করে চলে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখার লক্ষ্যে। মিশর, জর্ডান, ইয়েমেন, কাতার, কুয়েত, ওমান ও ইরাকীদের ভাষা আরবী হলেও তা আরবের আরবী ভাষা নয়। মিশরের লেখক নাগব মাহফুজ মিশরীয় আরবীতে সাহিত্য রচনা করে তামাম আরব বিশ্বের প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন।

তাই কবি কাজী নজরুল ইসলামের বানী- তুই নিভুর কর আপনার পর, আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর'-এর মর্ম অনুধাবন করে জাতীয় কবির বৈশিষ্ট ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। এদেশীয় রবীন্দ্র ভক্তিতে শ্রেষ্ঠদের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে ১৯৪৭-এর পর দুটি বাঙ্গালি জাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং দুই বাংলার সাহিত্য আলাদা- এ বাস্তবতা মনকে বড় করে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। ব্রিটিশযুগে এবং অবিভক্ত ভারতে শোষিত-বঞ্চিত-নিগৃহীত মুসলমানদের অবাধ আত্নবিকাশের সুবিধা এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলেই মুসলমানদের টিকে থাকা আর ইংরেজ সমর্থন পুষ্ট হিন্দুদের আধিপত্য বিস্তারের বিরোধের কারনেই, '৪৭-এ ভারত খন্ডিত হয়েছিল। একই ভৌগলিক সীমায় বসবাসরত অধিবাসীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বেচে থাকার সমানাধিকার ভোগ করতে পারলে সেই বিভাজন ঘটতনা। এ বিভক্তিই ছিলো উত্তরকালে বাংলাদেশ অর্জনের প্রথম সিড়ি। দুই বাংলার মানুষের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যত গড়ার পথও ভিন্ন। তাই এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষগুলো ভাষাগতভাবে এক জাতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রেক্ষিত ব্যতীরেকে দুই বাংলার সাহিত্য এক হলেও ভাষা চর্চা একচেটিয়াভাবে কারো এখতিয়ার ভূক্ত নয়। দুই বাংলার মানুষেরাই ভাষাভিত্তিক বাদালি জাতি, যেমন- ইংরেজ, চীনা, জাপানী, ফরাসী, তুর্কী জার্মান পভৃতিরা। দুদিককার বাঙ্গলিদের মধ্যেও উপরোক্ত ভাষাভিত্তিক জাতিগুলোর মতো রক্ত ও ধম্রের মিল নেই। তাইতো রবীঠাকুর তাঁর ভাষাও সাহিত্য- ১৯৩৯, শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন- বাংলা একটা নয়, দুইট্যৃ, বাংলাদেশের ইতিহাস খন্ডিত ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ভাগ শুধু কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নেই। এতকাল যে আমাদের বাঙ্গালি বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হলো, আমরা বাংলায় কথা বলে থাকি। তথাকথিত বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের অগ্রপথিক রবীঠাকুর মহারাজ শিবাজীর ছত্রছায়ায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ নিয়ে এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে, এক কন্ঠে বলতো-জয়তো শিবাজী। মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙ্গালি এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে রাজি। এক ধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড, ছিন্ন,বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে দেয়ার ধারনা পোষনের

কারনেই রবী ঠাকুর বাঙ্গালি বলে সংজ্ঞায়িত হতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাই এদেশীয় উন্মাতাল রবী ঠাকুরের ভক্তদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কেন রবী ঠাকুর ভেতরের ন্যজ্যটি কাটতে পারেননি।

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন বলেন- আমাদের ভৌগলিক অবস্থান ও জাতি ভিন্ন। এমনকি উচ্চারনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা। সেইজন্য আমাদের সাহিত্য ভিন্নতর হবে, যেখানে আমাদের ঐতিহ্য ও চেতনা ভিন্ন। ত্রয়োদশ শতকে সেলজুক তুর্কী মুসলমানদের শাসনামল থেকে মুলুক-ই বাঙ্গালাহ-এর যে রাজনৈতিক চৌহদ্দী সৃষ্টি হয়েছিল, কালের প্রবাহে আবর্তন-বিবর্তন তাতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতায়, ঐতিহ্য-কৃষ্টি-স্থাপত্যে ও সামাজিকতার মৌলিক প্রভেদ দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীরোদ রঞ্জন চৌধূরী প্রমুখ হিন্দু পন্ডিতেরা এই স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্নদা শংকর রায় বলেন- কেবল ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করি। ভাষা ও ধর্ম- কোনটাই একজাতি বা এক রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারেনা। স্বাথের্র সঙ্গে স্বাথের্র একত্ব থাকা প্রয়োজন। ভেদ রক্ষা করে মিল হয় না। একই ভাষায় কথা বললেও সকল মানুষের জীবনবোধ এবই হয় না। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সনে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং তার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-তথা বাংলা সভ্যতার অভিব্যক্তি কেন্দ্রিভূত হয়েছে। একবিংশ শতকের অগ্রযাত্রায় ঢাকাই হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তৎপরতার ভিত্তি। ধানের দেশ, গানের দেশ- বাংলাদেশ একটি গৌরবময় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে সামনে এগোচ্ছে। এ ধারাটিকে বাধগ্রস্থ করার জন্য নানা স্টাইলে, ঢং, পোষাক-আবরনে হররোজ বিরামহীন আগ্রাসন চলছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, মাইকেল জ্যাকসনী স্টাইল, ড্রাগন-পপ-ব্যান্ড নৃত্য-মিউজিক, ইংরেজী বাংলা নববষের্র অনুষ্ঠান, একুশের উৎসব, বসন্ত ও বৈশাখী মেলা এবং অন্যান্য জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে বাঘ, ঘোড়া, হাতি. কুকুর, বাঁদড়ের মুখোশ পরে ঢাকের বাদ্য, কাঁসার ঘন্টা, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহকারে যুবক-যুবতীদের আকর্ষনীয় দেহ-বলøরীর কুৎসিত উত্তেজক নর্তন-কুর্দন আমাদের সমাজের রুচি-নৈতিকতার মানকে নেম্নগামী করে জনমানস ও জনমনকে প্যারালাইজিড করে দিচ্ছে। ক্যাসেট নিভ্রর সংস্কৃতি তথা ইউরো-মার্কিন-ইন্দো বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সুরুচি, শালীনতাও সম্ভ্রমবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের তরুন প্রানের সজীবতা অবনৈতিকতার অতল গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে সহিংসতা, আগ্রাসী ভাবধারা ও অসুস্থজীবন বোধ জন্ম নিচ্ছে। ক্রকে আমাদের সংস্কৃতির রং বদলে যাচ্ছে। জাতীয় পতাকা যেমন একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র্য জাতির পরিচয় বহন করে, তেমনি সংস্কৃতিও একটি স্বতন্ত্র্য জাতির পরিচায়ক। একটি পতাকার রং বদলের মতো সংস্কৃতির রূপ পাল্টে দিয়েও একটি জাতির পরিচয় মুছে দেয়া যায়, ব্যয়-বহুল সামরিক অভিযানের কোন প্রয়োজন নেই। আজকে আধিপত্যবাদীরা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চিনে-বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে ফেলে দিয়ে আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করছে। এ নতুন টেকনিক আমাদেরকে জয় করে নেবে, দেশও দেশবাসী তাদের বংশবদ হয়ে যাবে। তা রুখতে হবে। ঢাকাকে কন্দ্রে করে বাংলা সাহিত্যের যে বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, তাকে জোরেসোরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য আকর্ষন হ্রাস করতে পারলেই নিজকে চেনা যাবে, প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সগম হবে। স্বকীয়তা বা নিজস্বতাতে একটি গর্ব আছে, আছে শান্তি ও স্বস্তি। নিজস্বতার গর্ববোধের অনুভূতি প্রতিটি স্বাধীন ব্যাক্তি ও

জাতির সবচেয়ে বড় জিনিস, তাইতো ইংরেজী ভাষী মার্কিনীরা অনেক শব্দের বানান ও উচ্চারনে ব্রিটিশদের থেকে পার্থক্য রক্ষা করে চলে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখে।

এ ক্রান্তিলগ্নে আমাদের জাতীয় কবির কর্মময় জীবন ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে; যাতে করে প্রবীনদের সাথে সাথে নবীনরাও অনুপ্রানিত হয়। তাহলে নজরুল প্রেরনা তথা স্বজাতীয় বোধ জন-জীবনের প্রেরনার উৎস হবে। তাহলে কবি নজরুল সাধারন্যে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। নজরুলের ঐতিহ্য-চেতনার নব আলোকে প্রাপ্ত মুসলিম বাঙ্গালি যুব সমাজ নজরুল ও তাঁর ঐতিহ্য-চেতনাকে আঁকারে ধরে সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হবে। নজরুলের কাব্য-চেতনার নব আলোকে বাঙ্গালি যুব সামজকে নতুন পথের দিশা দিতে হলে সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্যাক্তিবর্গকে নজরুল ইনস্টিটিউট, ট্রাস্টিবোর্ড, একাডেমী ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাহলেই অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। শুধু রাঁচি, কাশী, দিলø্গী, গৌহাটী ও পশ্চিম বঙ্গের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এম, এ, ক্লাশে-কোন বাঙ্গালি মুসলমান এর লেখা পড়ানো হয়না; যে বিশ্ববিদ্যায়য়ের মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সমাহিত করা হয়েছে, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এখানকার আর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে রবী ঠাকুরের সবকিছু পাঠ্য এবং তার সাথে রয়েছেন বিহারীলাল, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, মধুসুদন, শরৎ প্রমুখ অনেকের লেখা। পাঠ্য রয়েছে আবশ্যিকভাবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী-ও আরো অনেক কিছু। শুধু অবশ্য পাঠ্য নয় নজরুল, ডঃ লুৎফর রহমান, এম ওয়াজেদ আলী, ডঃ মুহঃ শহীদুলø্গাহ প্রমুখ মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা ও গভীরতা থাকলেও যথাযথভাবে মূল্যায়িত হচ্ছেন না উনারা। কোন মুসলমানের লিখা না পড়েও, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ, পাশ করা যায় বা করানো হয়। আবার এ পাশ করা ছেলে-মেয়েরাই কালক্রমে পাশের দেশের অখ্যাত-অজ্ঞাত য়ুনিভার্সিটি থেকে কুড়িয়ে আনা ডক্টরেট ড্রিগ্রী ঝুলিয়ে এ দেশীয় বিভিন্ন একাডেমী, টিভি-রেডিও ও নানা কর্মক্ষেত্রের উঁচু কেদারায় আসীন হয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তৎসম পন্ডিতজনের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদাঙ্ক অনুসরন-অনুকরন করে। তারাই আরবী-ফার্সি-উর্দ্দু-তুর্কী শব্দের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান ও মুসলিম ইতিহার-ঐতিহ্য-চেতনার পরিপন্থী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়। ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত জীবন-বোধই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সংস্কৃতির উৎসমূল। আর তারা ধর্মীয় বিশ্বাসকে শিথিল করে দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টায় অহোরাত্র নিয়োজিত রয়েছে। ফলে ধর্ম্মের বাঁধন শিথিল হচ্ছে, দিনের পর দিন ধর্ম চর্চায় ভাটা পড়ছে। সমাজে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে সুখী-সুন্দর সুস্থ জীবন ধারা। ক্রমে অশø্গীলতার পরিমান, বিশৃঙ্খলার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা কৌশলে, নানা উপচার-উপকরনের মাধ্যমে আমাদের যুব সমাজকে ধর্ম থেকে দূরে আনা হচ্ছে, তাই বাড়ছে যুব সমাজের অস্থিরতা ও অধঃপতন।

৪৭-এর দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তান আমলে এদেশে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিপুল উন্নতি-অগ্রগতি ও স্বাতন্ত্র্য সাধিত হয়েছিল, তাকে অতলে তলিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং এপার-ওপার বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে এক মঞ্চে এনে সমভাবে ভারতীয় করনের মতলবে ১৯৭২ সনে ভারত-বাংলাদেশ শিক্ষা-

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ গঠিত হয়। তৈরী হলো নতুন ছকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য স্যচী। এই সংসদের সুবাদে এদেশটাকে অবাঙ্গালি করনের মহাপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হলো। এদেশের ভারতপন্থী বাঘা বুদ্ধিজীবীরা প্রচারনা শুরু করেন-ধমের্র নামে পাকিস্তান হয়েছে, আর পকিস্তান মানে ইমলামের প্রতিছায়া। পাকিস্তানের কারনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ইসলাম শুধু ধর্মমতই নয়-একটি পূর্ণ জীবনাচার-যার ব্যাপ্তী ও প্রভাব সমগ্র ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবন ব্যাপী। এধর্মই অশান্তির কারন, ধর্মকে রাজনীতি, শিক্ষা, প্রশাসন ও সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তাই ইসলাম রাষ্ট্র ধমের্র মর্যাদা হারালো। পাশের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সূচনা সঙ্গীত হিসাবে বন্দেমাতরম; বৃটেনে খৃষ্টীয় ধর্ম অনুসারে প্রার্থনা খৃষ্টান-অখৃষ্টান সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতাম্যলক হলেও, এদেশের বিদ্যাপীঠের শিখন্ডি সেজে স্নাতক, প্রভাষক, প্রভাষিকা, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রাধ্যক্ষ, উপাচায্যর্রা আমাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রনের হাল কষে ধরেছেন।

অধূনা কলেজ, ইউনিভার্সিটি, পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন প্রকাশনা, বইপত্র, খবরের কাগজ, পাক্ষিক, সাময়িকী, সুভ্যেনির ইত্যাদিতে ষড়যন্ত্র ম্যলক হীনমন্যতার কারনে আরবী-পার্সি শব্দ, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য, নামাবলী ও পদ বর্জিত হয়ে এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যার প্রভাবে আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্খাই ধূলি-ধূসরিত হচ্ছে না, আমাদের ভাষাভিত্তিক বৈশিষ্ঠ্য-স্বকীয়তাও প্রায় বিলুপ্ত হবার পথে। স্বরস্বতী, রামকৃষ্ণ, চিত্তরঞ্জন, মানময়ী, ভারতেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, জগন্নাথ, হলিফেমিলি, হলিক্রস, সেন্টযোশেফ, সেন্টগ্রেগরিয়াস, সেন্টপল, সেন্টগ্রেগরি, নটরডেম বহাল তবিয়তে রয়েছে। প্রগতির নামে শেরে বাংলা ফজলুল হক গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ হয়েছে নারী শিক্ষামন্দির, ফজিলাতুননেসা হল রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে মুক্তি জয়তী হল। প্রগতির ভরা জোয়ারে ভেসে গেছে কায়দে আজম কলেজ, জিন্নাহ হল, ইকবাল হলের কায়দে আজম, জিন্নাহ, ইকবাল, নজরুল প্রভৃতি পদবাচ্যগুলো। পাকিস্তানী ধ্যান-ধারনা মুছে ফেলতে গিয়ে বিদুরিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের মনোগ্রাম থেকে 'রাব্বি জেদনি ইলমা', ইক্বরা বেইসমি রাব্বিকা'। প্রগতির ছাপ লাগাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুলøাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হলের 'মুসলিম' মুসলিম শব্দকে বর্জন করা হয়েছে। দ্রুত অপস্যয় হচ্ছে তেলাওয়াত, ছালাম, খোদা হাফেজ, খোশ আমদেদ। এখানে-সেখানে নির্মিত ইট পাথরের অবয়ব নিয়ে দাড়িয়ে গেছে অনেক বীর। মোনাজাতের বদলে অগ্নিশিখার সামনে দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হচ্ছে। মঙ্গল ঘট বসিয়ে সূচনা বা বন্দনা সঙ্গীত গেয়ে শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান মালা। কদাচ ঢাকার পাঁচিলে দেখা যায় 'রামের দেশে রাবন বধিতে আয়, আয় ছুটে আয় জনতা'। ভাবটা মনে হয় মধু-যদু 'পাচুরাম' সঙ্গে আছে যোগীরন নেড়ে দেখলে টিবি নেড়ে তেড়ে আসবে মারতে'।

ভাষার সঙ্গে কৃষ্টির স্বকীয়তা সংযোগ প্রত্যক্ষ। যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি থেকে দুইশত বৎসরের ইংরেজ সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক বেঙ্গলের পূর্বাংশে ১৯৭১ সনে পৃথক জাতি সত্তার উত্থান ঘটেছিল, নির্মল জাতীয় পরিচিতি ও কৃষ্টিক স্বকীয়তার অভাব হেতু রবী ঠাকুরের ভাষায় 'বাংলা শুধু দেহেই নয়, অন্তরেও দুই' এর ব্যবধানের অবলুপ্তির প্রক্রিয়া দ্রুত অগ্রসরমান। মগজ-বেচে বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের কারনে ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে অবাঙ্গালী মুক্ত ধারন প্রক্রিয়া সুকৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয়ত্বের মাধ্যাকর্ষনে কেন্দ্রমুখী ধাবিত হচ্ছে। হিন্দি আদলে বাংলা হরফের লিখা আজকাল শুধু ভারত বিচিত্রাতেই সীমাবদ্ধ নয়। টিভি-রেডিও, পত্র-পত্রিকা সহ অন্যান্য সব প্রচার মিডিয়া গুলোতে ও সেবা দান ক্রয়ের জন্য

পঁড়শীরা অজস্র রুপী ঢালছে। কাজেই অবাংলাদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলায় সময়োপযোগী সুষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহনে কালক্ষেপন করা হলে, সময়ের গতিময়তায় যদি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কৃষ্টিক বিজয় হয়ে যায়, পশ্চাতে সামরিক বিজয় আপসে এসে যাবে। ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকলা-ভাস্কর্য্য, নাম-পদবি, চিরায়ত মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নির্মিত সাম্প্রদায়িক সম্পীতি, জাতিগত ঐক্য ও সংহতির দেশটির নিজস্ব সংস্কৃতির প্রগতিশীল রূপায়নে দেশ প্রেমিক, আদর্শ সচেতন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও স্বাধীন চেতা অধ্যবসায়ী লোকের প্রয়োজন অধিক।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্যহে নজরুল চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে একজন সম্মানিত অধ্যাপকও রয়েছেন। নজরুল চেয়ার অলংকৃত করা উচিত ঐ সমস্ত প্রাজ্ঞজন, যারা নিষ্ঠার সঙ্গে নজরুলকে খুঁজে নিয়ে নিশ্চিন্তে ও সার্বিক নিরাপত্তায় হাতখুলে লেখা বলার মনন ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। বিলক্ষন প্রতিবন্ধকতার সহায়-সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও নজরুল সাহত্যকম্মের সময়ানুক্রমিক পূর্নাঙ্গ মূল্যায়ন করতে হলে, বিভিন্ন শাস্ত্র ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পৌরানিক বিপর্যয় সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা ও ভাষা-ভিত্তিক জ্ঞান থাকতে হবে। বচন বাগীষ বুদ্ধিজীবীদের মতো নজরুলের এ কবিতার কিছু অংশ, ঐ রচনার দুই লাইন, কোন প্রবন্ধ-নিবন্ধের কয় পংক্তি নিয়ে লিখলেই নজরুল জীবন ও সাহিত্য কর্মেও মূল্যায়ন হয় না। ধারাবাহিকভাবে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস শ্রমদান করেই কবির অমর প্রতিভাকে জনসমক্ষে হাজির করতে হবে। তাই জন্ম-মৃত্যুদিনের অনুষ্ঠান মালায় নজরুলকে বন্দী করে রাখলে চলবেনা। মানুষের কবি, মানুষের মুক্তির কবি ও আমাদের স্বাধীনতার অগ্রপথিক নজরুলকে আরো জানতে হবে, জানাতে হবে, এবং গবেষনা করতে হবে। গায়ক, শ্রোতা, প্রকাশক ও পাঠকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্নস্তর থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নজরুলকে আবশ্যিক পাঠ্য করতে হবে, যিনি একদিন কচি-কিশোরদের ভোর হলো দোর খুলো; তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ ও গরীয়ান, জাগো দুর্বার, বিরাট, বিপুল অমৃতের সন্তান-বলে ডাক দিয়েছিলেন এবং যাবার বেলায় নবীনদের বলেছেন-জাগো চির অমলিন দর্জয়, ভয়হীন। আসুক শুভদিন, হোক নিশিভোর। সমাজের সংঘাত-সংঘর্ষ বিদুরিত করে সুখী, সুন্দর-সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তিনি যুবাদের আহবান জানিয়েছেন ধর্ম, বর্ণ, জাতির উর্দ্ধে জাগোরে নবীন প্রাণ; তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান, তাই যুবা-কিশোর, নবীন-প্রবীন সবাইকে পিছন ফিরে তাঁকে খুজে নিতে হবে। কেননা, অপসংস্কৃতি রোধ এবং ভাষা-সাহিত্য সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয়তা বোধকে প্রতিষ্ঠিত ও মজবুত করতে ব্যপক নজরুল চর্চার প্রয়োজন। ঘটা করে কবির জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করে দু-চারটি দৈনিকের পৃষ্ঠায় লেখা লেখিতে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবিবিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু ব্রিটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচার-নিপীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা, সামাজিক ভেদ-বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ইত্যাদি বহুবিধ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা এবং সংগ্রাম করেননি। তিনি

বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনেক সঙ্কীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন এবং নানা ধরনের বাধার আগল ভেঙে দিয়ে নিজের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার কল্যাণে ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অনন্য সাধারণরূপে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। নজরুল তাঁর একটি কবিতায় নিজের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করবো সেথায় বিদ্রোহ।' বাংলা ভাষার আগল অর্থাত্ নানা ধরনের প্রতিকূলতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা এবং বাধা-বন্ধকতা ভেঙে অনেক নিষিদ্ধ, অবহেলিত, অচ্ছুত্ ও ইতর এবং অভব্য শব্দ ব্যবহারের জন্য দরজা খুলে দিয়ে নজরুল কীভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন এবং সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে নিজের রচনায় নবরূপায়ণের মাধ্যমে সমুজ্জ্বল করেছেন, নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন, তার পরিমাপ করতে এবং স্বরূপ তুলে ধরতে হলে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

আমরা জানি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের। বাংলাভাষী মানুষের তথা জনগণের মুখের বুলি, তাদের কথোপকথনের এবং ভাব-বিনিময়ের ভাষার জন্ম কত সুপ্রাচীনকাল আগে এবং তার স্বরূপ আর রূপ-প্রকৃতিই বা কী ছিল, তা নির্ণয় করা কঠিন। সুপ্রাচীনকালের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর তথা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার বৈচিত্র্যময় রূপের পরিচয় আবিষ্কৃত না হলেও, বাংলা সাহিত্যের তথা কবিতার আদি-নিদর্শন 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২১ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ'-এর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধ যুগে রচিত এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সৃষ্ট এসব পদাবলীই বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। এক ধরনের হেঁয়ালি বা 'সান্ধ্য-ভাষা'য় রচিত এসব বৌদ্ধ-গান ও দোঁহা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কিনা, সাধারণ জনগণ চর্যাপদের ভাষায় কথা বলত কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। যদিও বৌদ্ধ-যুগে তথা পাল রাজাদের শাসনকালে পালি-প্রাকৃত ছিল রাজকার্যের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার ভাষা। হিন্দু শাসনামলে তথা সেন রাজাদের শাসনকালে সংস্কৃত ছিল রাজকার্যের ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও ভাষা। যদিও জনসাধারণের মুখের বুলি তথা নিত্যদিনের কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত ছিল, এমন কোনো প্রমাণ মেলে না। সংস্কৃতের প্রভাব সত্ত্বেও সংস্কৃত থেকে যে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেনি, ভাষাতাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও গবেষকদের দ্বারা তা স্বীকৃত। এ সত্যও ইতিহাস স্বীকৃত যে, সেন রাজারা সংস্কৃত চর্চায় এবং সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনায় উত্সাহ জোগালেও, বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মুসলিম শাসনামলে ফারসি ছিল রাজকার্যের ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিরও ভাষা। কিন্তু ফারসির ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও, জনগণের মুখের বুলি তথা নিত্যদিনের কথোপকথনের ভাষা ফারসি ছিল না। উলেøখ্য, মুসলিম রাজাদের শাসনকালে, বিশেষ করে সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়। সংস্কৃত ও ফারসি থেকে উলেøখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ অনূদিত হয় বাংলা ভাষায়। ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি রাজকার্যের ভাষা এবং উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ভাষা থাকলেও, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা, বিকাশ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটে। বাংলা গদ্যের এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা ব্রিটিশ শাসনামলেই। তবুও এ কথা সত্য যে, ইংরেজির ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও, ইংরেজি কখনো সাধারণ জনগণের মুখের বুলি তথা নিত্যদিনের কথোপকথনের ভাষা হয়নি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি নজরুলের ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় অবদান বিশেষ করে বাংলা ভাষার আগল ভাঙার ক্ষেত্রে তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুপ্রাচীনকালের এবং বিভিন্ন যুগের ইতিবৃত্তের অবতারণা করতে হলো এ কারণে যে, নজরুল তাঁর রচনায় বিশেষ করে কবিতা ও গানের ভাষায় সমগ্র বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে ধারণ করেছেন এবং বিষয়, ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন রূপে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের রচনায় বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, তুর্কি, ফরাসি, জার্মানি ইত্যাদি বহুবিধ দেশি-বিদেশি ভাষা তথা শব্দাবলী বাকবন্ধ, ইডিয়ম, ফ্রিজোলজি অবলীলায় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় কবিতা-গান রচনা করা ছাড়াও, আরবি-ফারসি, সংস্কৃত-হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থেকে কবিতাও অনুবাদ করেছেন, আরবি ও সংস্কৃত ছন্দে রচনা করেছেন কবিতা। বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবি-সাহিত্যিক ভাষা চর্চায় এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে এত বৈচিত্র্যময়তার সাধনা করেছেন কিনা বলা কঠিন। বাংলা সাহিত্যের দুই যুগস্রষ্টা কবি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নজরুলের মতো এত ভাষা-বৈচিত্র্যের সাধক নন। আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি মুসলিম

ঐতিহ্যমূলক ভাষা তাঁরা তেমন ব্যবহার করেননি। প্রশ্ন হতে পারে, নজরুল বাংলা ভাষার আগল ভেঙেছেন কীভাবে? এ বিষয়ে উপরিউক্ত বক্তব্য এবং তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের পরও বলব, সাহিত্যে ভাষার সঙ্গে বিষয়ের, অর্থাত্ ভাব এবং বক্তব্যের সুনিবিড় ও সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভাব নেই কিন্তু রূপ আছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনটি অকল্পনীয়। ভাব বা বক্তব্যকে অবলম্বন করেই রূপের বিকাশ; অর্থাত্ শিল্পরূপের সৃষ্টি। মানবতাবাদী ও জীবন-শিল্পী কবি নজরুল বিধি-নিষেধের আগল ভেঙে দিয়ে দেশের সব ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম-সাধনাকে ভাষা দিয়েছেন। তার রচনায় বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মীয় জনগোষ্ঠী তথা সম্প্রদায়ের জীবনের কথা, তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সাহিত্যিক-রূপায়ণ। নজরুলের মতো বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবি হিন্দু-মুসলমানের জাগরণমূলক এবং তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ক এত বেশি সংখ্যক কবিতা-গান বিশেষত কীর্তন, ভজন, দেবীস্তুতি, হাম্‌দ, না'ত্ ইত্যাদি লিখেছেন কি? ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিষয়ে রচিত তাঁর কবিতা-গানে তিনি অবলীলায় মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দ, বাকবন্ধ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। অন্যপক্ষে হিন্দু ঐতিহ্যমূলক বিষয়ে তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত, হিন্দি ইত্যাদি শব্দ, বাকবন্ধ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবির রচনায় ব্যাপকভাবে এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় মিলবে না।

বাংলা ভাষার আগল ভাঙার ক্ষেত্রে নজরুলের ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা এবং তার সাহসিকতার আরেক প্রমাণ, হিন্দু ঐতিহ্যমূলক বিষয়ে কবিতা-গান ও অন্যান্য ধরনের রচনা লেখার এবং হিন্দুয়ানী অর্থাত্ হিন্দু-ঐতিহ্যমূলক শব্দাবলী ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতীক ব্যবহারের কারণে একশ্রেণীর গোঁড়া মুসলমান তাঁকে 'কাফের' ফতোয়ায় অভিষিক্ত করে। অন্যপক্ষে ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিষয়ে কবিতা-গান ও অন্যান্য ধরনের রচনা লেখা এবং মুসলিম ঐতিহ্যমূলক শব্দাবলী ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প-রূপক-প্রতীক

ব্যবহারের কারণে একশ্রেণীর গোঁড়া হিন্দু তাকে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে। বিদ্রোহী ও মানবতাবাদী নজরুল এতে বিন্দুমাত্রও ভীত না হয়ে একটি কবিতায় লেখেন : 'মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল-লারা কন হাত নেড়ে',/দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে।/ফতোয়া দিলাম্ কাফের কাজী ও,/যদিও শহীদ হইতে রাজি ও।/ 'আমপারা'-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে'/হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত-নেড়ে।' [আমার কৈফিয়ত্, সর্বহারা]

এটা সর্বজনবিদিত যে, বিভিন্ন মহল থেকে প্রবল বৈরিতা এবং নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা আর সমালোচনা সত্ত্বেও বিদ্রোহী নজরুল বাংলা ভাষার আগল ভাঙার অর্থাত্ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষার নানাধর্মী শব্দের ব্যবহারে বিরত হননি। নজরুলের রচনায়, বিশেষত তাঁর কবিতা-গানে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যবাহী শব্দ, ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ, জনজীবনে প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ, নাগরিক শব্দ, গেঁয়ো বা গ্রামীণ শব্দ, লোকজ শব্দ, ইতর তথা অভব্য শব্দ প্রয়োজনবোধে অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, নজরুলের আবির্ভাবের বহুকাল আগে, মধ্যযুগে ও আধুনিককালে অনেক প্রতিভাবান হিন্দু ও মুসলমান কবি তাঁদের কোনো কোনো রচনায় সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার করেছেন। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, বিষয়বস্তু কিংবা কাব্যের আখ্যান-ভাগ মুসলিম ইতিহাস এবং ঐতিহ্যমূলক হলেও, মুসলিম কবির কাব্যের ভাষায়ও আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দাবলীর বদলে সংস্কৃতানুসারী শব্দাবলীর ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে; কিন্তু আধুনিক যুগে নজরুল বাংলা ভাষার আগল ভাঙার ফলে অর্থাত্ বিষয়ানুসারে ভাষা ব্যবহারের দরুন তার সমসাময়িক ও উত্তরসূরি বহু মুসলিম কবি, এমনকি অনেক হিন্দু কবিও আরবি-ফারসি শব্দ এবং সংস্কৃতানুসারী শব্দ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বিশ্বাসী নজরুল বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভ্রূ কুঁচকানো অন্যায়।' (অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁকে লিখিত পত্র)। ওই পত্রে নজরুল আরো বলেন, 'আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।... ...তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই।'

তিনি আরো বলেছেন, ইসলামের প্রাণশক্তি : গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ। ...আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি।' বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে অনেক প্রতিভাবান ও শক্তিশালী কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। অনেক মানবতাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক কবিরও আবির্ভাব ঘটেছে; কিন্তু তাদের কেউই বিদ্রোহী ও মহান মানবতাবাদী কবি নজরুলের মতো হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা এমন গভীর বিশ্বাস ও দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেননি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক শব্দ-সম্ভার ও ভাষা ব্যবহার করেননি, উভয়ের ঐতিহ্যের রূপায়ণ ঘটাননি। নজরুলের কবিতা ও গানে এবং অন্যান্য রচনায় ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিষয় এবং মুসলিম মনীষীদের জীবন মাহাত্ম্য যেমন দীপ্যমান ও মহিমান্বিত হয়েছে, তেমনি হিন্দুদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিষয় এবং হিন্দু মনীষীদের জীবন

মাহাত্ম্য ও দীপ্যমান ও মহিমান্বিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আগল ভাঙার এবং সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারার কারণেই বিদ্রোহী ও মানবতাবাদী নজরুলের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। বিদ্রোহী কবি তার রচনার বিচিত্রধর্মী ভাষা আহরণ করেছেন সমাজ-পরিবেশ থেকে, ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে, অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'প্রলয়োল⌀াস' কবিতায় এক স্থানে বলেছেন : 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর।/তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি নজরুল শুধু পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির, পুরনো সমাজ ভেঙে নতুন ও উন্নত সমাজ গঠনের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভেদের এবং সঙ্কীর্ণতার আগল ভেঙে নতুন ঐতিহ্য গড়ার ধারা সৃষ্টি করে গেছেন, রেখে গেছেন অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগেরএমনকি আধুনিক যুগের নজরুলের পূর্বসূরি এবং সমসাময়িক কোনো কোনো কবি (যাদের মধ্যে মুসলমান এবং হিন্দু কবিও আছেন) তাঁদের রচনায় বিষয়ানুসারে কিছু কিছু আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দ এবং শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন বটে; কিন্তু তাঁরা বিদ্রোহী কবির মতো হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা ভেবে এবং জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন অনুধাবন করে, বাংলা ভাষার আগল ভাঙার অর্থাত্ ভাষা ব্যবহারেআরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি ইত্যাদি যে কোনো ধরনের ঐতিহ্যবাহী শব্দ ব্যবহারে সঙ্কীর্ণতা ও ছুঁত্মার্গী মনোভাব পরিহার করে এই দায়িত্ব কতটা পালন করেছেন বলা কঠিন। নজরুলের কাব্যগ্রন্থ যারা পাঠ করেছেন, তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, প্রথমদিকে তাঁর রচনায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি মুসলিম ঐতিহ্যবাহী শব্দের নিচে অর্থ হিসেবে তথাকথিত বাংলা শব্দ তথা সংস্কৃতানুসারী শব্দ মুদ্রিত হতো : যেমন গোর (কবর), কালাম (হুকুম), ভাই-বেরাদর (আত্মীয়-স্বজন), সিপাহসালার (প্রধান সেনাপতি), সিয়া (কৃষ্ণবর্ণ), মুর্দা (মৃত), পিরহান (পিরান) ইত্যাদি। এমন অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়। কিন্তু শব্দ ব্যবহারে নজরুলের সাহসী ভূমিকায় এই সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটে।